সিরিজ ৩-৪

কিশোর কানন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.
হযরত সাঈদ ইবনুল আস রা.

কিশোর কানন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)

মাওলানা ফজলুদ্দীন শিবলী
সিনিয়র শিক্ষক. মাদরাসা তাহ্‌ফিজুল কুরআনিল কারিম
দারুল ইহ্‌সান ট্রাস্ট, আশুলিয়া, ঢাকা

আল মাকতাবাতুল হানাফিয়্যাহ
ইসলামী টাওয়ার, ১১ / ১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ২০০৮ ঈ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)

□ প্রকাশক : মাওলানা মাসুম বিল্লাহ
আল মাকতাবাতুল হানাফিয়্যাহ

□ স্বত্ব : সংরক্ষিত □ প্রচ্ছদ : আমিনুল ইসলাম আমিন

□ কম্পোজ : ব ই ঘ র বর্ণসাজ ৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা

মূল্য : ৫৬ টাকা মাত্র

ISBN 984-70097-0011-8

কিশোর কানন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)

আমাদের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দশজন বিখ্যাত সাহাবীর কিশোরকালের সোনালী জীবন নিয়ে কিশোর কানন সিরিজের যাত্রা শুরু হলো। এ সিরিজের আওতায় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সাহাবী, তাঁর সংগ্রামী বিবি-কন্যাগণ, বিখ্যাত মহিলা সাহাবী, উল্লেখযোগ্য শুহাদায়ে সাহাবাসহ পুণ্যময় ইসলামী মনীষীগণের শিশু-কিশোর জীবনী সহজ সরল গদ্যে, গাল্পিক ভঙ্গিমায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

আমাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। বাংলা ভাষায় শিশু-কিশোরদের উপযোগী বই-পুস্তকের সংখ্যা এমনিতেই কম। যাও বা আছে, তা তথ্য ও বানান বিভ্রাটের পাশাপাশি নানাবিধ পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। বড়দের বইয়ের তুলনায় শিশুদের বইয়ে ভুল থাকার অপরাধ অবশ্যই বড়। কেননা যেসব পঠন সামগ্রীর মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মেধা মনন শানিত হবার কথা, তাতে যদি ভুল ও তথ্য বিভ্রাট থাকে তাহলে তা হবে হিতে

বিপরীত। সোনালী যুগের সোনালী মানুষের জীবন অধ্যয়নের মধ্যেই শিশু-কিশোরদের সত্যিকার মানসিক বিকাশ লাভ সম্ভব। তাই এ সিরিজের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ছেলেবেলাকেই প্রাধান্য দিয়েছি। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে সম্পর্কিত মানুষজনের চেয়ে আলোর পথের কাফেলা আর কোথায় মিলতে পারে?

আমরা বুকভরা আশা নিয়ে আলোর পথের যাত্রী মহান মনীষীদের ছেলেবেলা আজকের শিশু-কিশোরদের সামনে তুলে ধরছি। আমাদের বিশ্বাস, এ বইগুলোতে শিশু-কিশোররা সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার উপাদান পাবে। পরকালের সফলতার লক্ষ্যে দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর সহজ সরল ঈমানদীপ্ত পথে তুলে আনতে এ সিরিজের প্রতিটি বই ছোটদের পাশাপাশি বড়দেরও কাজে আসবে আশা করি। ঈমান-জাগানিয়া এসব মহান মনীষীর জীবন প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহ দরবারে শুকর আদায় করছি। এ সিরিজের বইগুলো পড়ে একজন মানুষও যদি আলোর পথের সন্ধান পান তবেই আমাদের শ্রম সার্থক মনে করবো।

বইগুলো নির্ভুল করাসহ সর্বাত্মক সুন্দর করতে আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। তথাপি মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। কারও চোখে কোন ভুল বা অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের জানালে

পরবর্তী সংস্করণে কৃতজ্ঞতার সাথে তা শোধরে নিতে সচেষ্ট থাকবো, ইনশাআল্লাহ। শিশু-কিশোরদের নিয়ে আরও বড় কাজ করার ইচ্ছা আমাদের আছে। তওফিকের মালিক মহান আল্লাহ। লেখকসহ বই প্রকাশে যাদের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি মহান আল্লাহর কাছে সকলের শ্রমের উত্তম প্রতিদান প্রার্থনা করছি। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

তারিখ
১ আগস্ট ২০০৮

বনীত
মাসুম বিল্লাহ

কে তিনি

যার কথা বলছি তিনি জ্ঞানতাপস, বিদ্যাসাগর, কুরআন বিশেষজ্ঞ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাত ভাই।

পিতা

আবুল ফজল আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালেব। ইসলাম গ্রহণকারী প্রাচীনদের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণকে গোপন রেখেছিলেন। মুশরেকদের সাথে বদরে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই বলেছিলেন–

مَنْ لَقِيَ الْعَبَّاسَ فَلَا يَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مُسْتَكْرَهًا

আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালিবের সাথে দেখা হলে কেউ যেন তাঁকে হত্যা না করে। [সাফওয়াতুস সাফা : ১/৫০৭] কেননা, তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে এসেছেন। আবুল ইয়াসার কাযাব ইবনে আমর তাঁকে

বন্দী করেছিলেন। তিনিই তাঁর জামিন হয়েছিলেন। ফলে তিনি মক্কায় ফিরে যেতে পেরেছিলেন।

মাতা

উম্মুল ফজল লুবাবা বিনতে হারেস (রা.)। হযরত খাদিজা (রা.)-এর পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আব্বাস (রা.)-এর সাথে বিবাহের আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনি ৩০টি হাদীস নকল করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুরে খেয়েদেয়ে তাঁর বাড়িতে ঘুমাতেন। স্বামী জীবিত থাকতেই উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

খালা

উম্মুল মুমিনীন সাইয়িদা মাইমুনা বিনতে হারেস (রা.)। তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদগ্ধ স্ত্রী ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকেই সর্বশেষ স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর তা সপ্তম হিজরীতে। বলা হয়, তিনিই সেই নারী যিনি সাগ্রহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর ব্যাপারেই কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয়েছিল–

وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ (سورة الحزاب)

> আর কোন মুমিন নারী যদি নবীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে (এবং নবী যদি তাকে বিবাহ করতে চান তাহলে সেও হালাল)। [সূরা : আহযাব : ৫০]

জন্ম

মক্কায় মুশরিকদের নির্যাতন তখন বেড়ে গিয়েছিল। এক পর্যায়ে নির্যাতনের ধারাবাহিকতায় তারা একটি অঙ্গীকারনামা লিখেছিল। এতে মুসলমানদেরকে বয়কট করার কথা ছিল। শুধু কি মুসলমানেরা? না, যারা তাদের সাহায্য করবে, সম্পর্ক রাখবে, বেচাকেনা করবে– সকলেই এর আওতায় পড়বে। ওই চুক্তিনামায় প্রকাশ, কেউ তাদের সাথে লেনদেন করতে পারবে না। বিয়ে শাদী পর্যন্ত নিষেধ। এই চুক্তিনামা লিখে পৌত্তলিক সন্তানেরা কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখল। মুসলমানদেরকে শিয়াবে আবি তালেবে অন্তরীণ করল। এটি একটি পাহাড়ী উপত্যকা। মুসলমানরা যেন এখান থেকে কিছুতেই বেরোতে না পারে এজন্য কড়া প্রহরা বসানো হল। কেউ যাতে যোগাযোগ করতে না পারে সে ব্যাপারে কড়া হুশিয়ারি দেওয়া হল। বাইরের কেউ প্রবেশ না করে এজন্য আগাম সতর্ক করা হল। বনী হাশেম গোত্রের লোক বিধায় আব্বাস (রা.) এ উপত্যকায় অন্তরীণ হতে বাধ্য হলেন। সঙ্গত কারণে তাঁর স্ত্রী উম্মুল ফজলও এই কঠিন উপত্যকায় অবরুদ্ধ হলেন। উপত্যকায় প্রবেশের সময় তিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়লেন তিনি। প্রশস্ত জীবন সংকুচিত হয়ে এল। গর্ভধারণের তীব্র কষ্ট হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলেন। তা সত্ত্বেও ঈমান-ইসলামের পথ থেকে বিন্দুমাত্র হটলেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সামান্যও বিরক্ত হলেন না।

তিনি সাইয়িদা খাদিজা (রা.)-এর স্বর্ণালী সংসর্গ পেয়েছিলেন। সেই সংস্পর্শই তাঁকে এ মহাব্রত সাধনে উৎসাহ দিয়েছিল। সেই অবিনাশী চেতনাই তাঁকে এ উপত্যকায় নামিয়েছিল। এখানে তিনি খাদিজা (রা.)-এর পাশটিতেই থাকতেন। তাঁর খাদ্য খাবারের একটা অংশ দিতেন। উল্লেখ্য, খাদিজা (রা.)-এর এসব খাদ্য-খাবার লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা দিয়ে যেত।

উম্মুল ফজলের যখন সন্তান প্রসবের সময় হলে এল তখন হযরত আব্বাস (রা.) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন– হে মুহাম্মদ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! উম্মুল ফজলের সন্তান প্রসবের সময় বুঝি ঘনিয়ে এসেছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَعَلَ اللهَ أَن يَّبِيْضَ وُجُوْهَنَا بِغُلَامٍ

আল্লাহর কাছে আশা একটি পুত্র সন্তান দিয়ে তিনি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেন। [বেদায়াহ-নেহায়াহ : ৮/২৯৫]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচীআম্মার সন্তান প্রসবের সময় যখন একেবারে ঘনিয়ে এল, প্রসব বেদনা উঠল, তিনি ব্যথায় কাতরাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁর কাছে এলেন। সালাম দিয়ে বললেন–

: উম্মুল ফজল!

: জী, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

: তুমি একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিতে যাচ্ছ।

তা কী করে সম্ভব হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! অথচ কুরাইশী নারীরা আমার লক্ষণাদি দেখে বলেছেন, মেয়ে সন্তান হবে।

আমি যা বলছি তাই হবে। বাচ্চা জন্ম নিলে আমার কাছে নিয়ে এসো।

উম্মুল ফজলের ব্যথা যখন চরম আকার ধারণ করলো তখন তিনি জীবনের মায়া প্রায় ছেড়েই দিলেন। অবশেষে তিনি একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তান জন্ম দিলেন। ন্যাকড়ায় পেঁচিয়ে তাকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে এলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। মুখের পবিত্র লালা নবজাতকের মুখে দিলেন। তারপর বললেন, ওকে নিয়ে যাও! জ্ঞানতাপস হবে ও ইনশাআল্লাহ!

উম্মুল ফজল (রা.) নবজাতক আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের দুধপানে লেগে গেলেন। তাকে মাতৃসুলভ মমতায় লালন করে যেতে থাকেন। এদিকে মুসলমানদের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যেতে থাকল। এর মধ্যে হযরত খাদিজা (রা.) ইন্তেকাল করায় পরিস্থিতি আরো মারাত্মক রূপ নিল। আবু তালেব এ সময় প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়লেন। কুরাইশরা আদা নুন খেয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে নামল।

উম্মুল ফজল (রা.) সর্বাবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছায়া দিয়ে গেলেন। তিনি সম্ভব সব ধরনের সাহায্য করে যেতে থাকেন। তবে আব্বাস (রা.) প্রকাশ্যভাবে ভাতিজাকে সাহায্য করতে পারছিলেন না। কেননা, তাঁর অগাধ সম্পদ ও ক্ষেত-খামার কুরাইশ সর্দারদের অধীনে ছিল। তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ প্রকাশ করেন এবং প্রিয় ভাতিজা ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সহায়তা করেন তাহলে তার সবই হাতছাড়া হবার আশংকা ছিল। [বেদায়াহ-নেহায়াহ : ৮/২৯৫]

হিজরত

শৈশবেই ইবনে আব্বাস (রা.) মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করেন। তাঁর মা তাঁর বাবা আব্বাস (রা.) থেকে হিজরতের অনুমতি চাইলে তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে একটি পত্র দিয়েছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও চাচাকে প্রতিউত্তর দিয়ে একটি পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রে উল্লেখ ছিল– চাচা! আপনার হিজরত হবে মক্কার সর্বশেষ লোকটির হিজরত। যেভাবে আমার নবুওয়ত সর্বশেষ নবুওয়ত।

হযরত আব্বাস (রা.) কালক্ষেপণ করছিলেন। তাঁর ব্যবসা ও সুদে লাগানো টাকাগুলো গুছিয়ে আনছিলেন। (উল্লেখ্য, এ সময় সুদ হারাম ঘোষণা হয়নি)। তাঁর স্ত্রী ও পুত্র সন্তানেরাও হিজরতের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। ইবনে আব্বাস (রা.) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাতের অপেক্ষায় ছিলেন। দরবারে নবুওয়াতে বসে নিজকে ধন্য করতে চাইছিলেন।

অবশেষে সেই মহেন্দ্রক্ষণটি এসে গেল। হযরত আব্বাস (রা.) সপরিবারে মক্কা থেকে সর্বশেষে বেরোলেন। তাঁরা যখন জুহফায় (মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী একটি এলাকা) পৌঁছেন তখন পথিমধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ মক্কা বিজয়কামী বিশাল বাহিনীর সাথে তাঁদের সাক্ষাত হয়। আব্বাস (রা.) ওই বাহিনীতে শামিল হন আর উম্মুল ফজল (রা.) সন্তানসহ মদীনা আগমন করেন। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মদীনায়ই ছিলেন।

নবীগৃহে ইবনে আব্বাস (রা.)

ইবনে আব্বাস (রা.) মদীনায় নীত হন। তখন তিনি ছোট্ট মানুষটি। শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পদার্পণ। মদীনা আসতে পেরে তিনি যারপরনাই খুশি। কেননা, এখন তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেখা পাবেন। ওহীর শিক্ষা খুব কাছে থেকে অর্জন করবেন।

যে কথা সেই কাজ। যেখানেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেই ইবনে আব্বাস (রা.)। তিনি তাঁকে ছায়ার মত ঘিরে থাকেন। নববী জ্ঞান-ঝর্না থেকে তৃষ্ণা নিবারণেই তাঁর এই ছায়ার মত ঘিরে থাকা। মসজিদে নববীতেই কেবল তিনি অন্যান্য সাহাবাদের মত বসে থাকেন না। প্রয়োজনে নববী হেরেমে তিনি প্রবেশ করেন। অধিকাংশ সময় তিনি খালা মাইমুনা (রা.)-এর সাথে খান দান ও ঘুমান।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মাইমুনা (রা.)-এর হুজরায় এলেন। বাইরে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু। তিনি উম্মুল মুমিনীন মাইমুনা (রা.)কে জিজ্ঞাসা করেন, ও নামায পড়েছে কী?

মুাইমুনা (রা.) বললেন, হ্যাঁ, নামায পড়েই ঘুমিয়েছে।

পরবর্তীতে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শুনেছি। তিনি খালাকে যা বলেছেন স্মরণ রেখেছি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভ্যাসমত যতটুকু ঘুমাবার ঘুমালেন। অতঃপর ওঠে ওযু করলেন। আমি উঠলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবশিষ্ট ওযুর পানি দ্বারা ওযু করলাম। আমার লুঙ্গিটা ভাল করে পরে নিলাম। তাঁর বামে দাঁড়ালাম। তিনি সাত অথবা পাঁচ রাকাত নামায পড়লেন বিতরসহ। নামায শেষে তিনি সালাম ফেরালেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) স্রেফ কৌতূহল কিংবা সময় কাটানোর জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্যে থাকতেন না। জ্ঞানার্জনই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। হেদায়েতের উৎস সন্ধানই ছিল তাঁর লক্ষ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মপদ্ধতির পূর্ণ সংরক্ষণই ছিল আশা। তাই তো তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমনও কর্মপদ্ধতি উম্মাহকে অবহিত করেন যা তাঁর মত অবস্থানে আসীন ছাড়া আর কেউ অবহিত করতে পারেননি। আসুন না এর খানিকটা ঝলক নিম্নোক্ত হাদীসে দেখা যাক

কোন এক রাতে ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনা (রা.)-এর ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। রাত গভীর হল। গোটা প্রকৃতিতে নিস্তব্ধতা নেমে এল। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি উঠলাম। তাঁর মত করে ওযু করলাম। তিনি তাঁর অভ্যাস মত নামায পড়লেন। আমি তাঁর পেছনে নামায পড়লাম।

তিনি বলেন, এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমালেন। আমি তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ শুনলাম। এরপর মোয়াজ্জিন এলেন। তিনি বিনা ওযুতে নামাযের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) আমাদের জানাচ্ছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তিনি অবস্থান করছিলেন। এ সময় তিনি একটি পাত্র থেকে পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে পান করলেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কসম খোদার! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনটা করেছেন আমি তেমনটা করে দেখাচ্ছি। আমি দাঁড়ালাম। ওযু করলাম। দাঁড়িয়ে পান করলাম। অতঃপর তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। তিনি ইশারায় আমাকে তাঁর সমান্ত রাল দাঁড়াতে বললেন। বললেন ডান পাশে দাঁড়াতে। আমি দাঁড়ালাম না। পেছনেই থেকে গেলাম। নামায শেষে তিনি বললেন–

কী ব্যাপার! আমার সাথে সমান্তরাল দাঁড়ালে না যে!

হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আমার চোখে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান মানুষ। সম্মানের সর্ব শীর্ষে। সুতরাং আপনার গায়ে গায়ে মিলে দাঁড়ান বড্ড বেমানান।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় বললেন, আয় আল্লাহ! তাকে অগাধ প্রজ্ঞাশীল কর। [হিলইয়াতুল আউলিয়া : ১/৩১৫]

ইবনে আব্বাস (রা.)কে প্রিয়নবী (সা.)-এর দুআ

মাতৃগর্ভ থেকে নিয়েই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রিয়ভাজন ছিলেন। তাঁর মা যখন কন্যা সন্তানের আশা করছিলেন সে সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আগমনের সুসংবাদটি

দিয়েছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে গুরুত্ব দিতেন। এর খানিক প্রমাণ দুধপানকালীন তাঁর মাথায় হাতের পরশ বুলিয়ে নিম্নোক্ত দুআ-দানের মধ্যে পাওয়া যায়– তিনি দুআচ্ছলে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে প্রাজ্ঞ ও কুরআন তাফসীরের সাগর কর।' আবার কখনও এই বলে দুআ দিতেন, 'হে আল্লাহ! তাঁকে তোমার বরকত পরশে বিমোহিত কর। পুণ্যবানদের কাতারে শামিল কর।' [বেদায়াহ-নেহায়াহ : ৮/২৯৬]

কেবল দুআ দিয়েই কি শেষ! না, তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, ওঠবসা, চলাফেরার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তিনি যেন দেখতে পেতেন, তাঁর নবুওয়তি শিক্ষাকিরণ দুরন্ত এ চাচাত ভাইটির মাঝে প্রতিফলিত হতে যাচ্ছে। জ্ঞানের নয়াদিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হতে চলেছে।

ইবনে আব্বাস (রা.)কে তিনি ইসলামের শেকড়-সন্ধান দিচ্ছেন, ঈমানের শক্ত মজবুত ভিত্তি শেখাচ্ছেন– নিজ বাহনের পেছনে বসিয়ে। বলছেন, 'বৎস! আমি তোমাকে কী এমন কিছু বাক্য শেখাব না, যা তোমার উপকারে আসবে?'

ইবনে আব্বাস (রা.) পরম আকর্ষণে সোৎসাহে জবাব দিচ্ছেন, কেন নয় হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! বলুন!

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন–

اِحْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، اِحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ
أَمَامَكَ......تَعَرَّفْ عَلَى اللهِ فِى الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ
فِى الشِّدَّةِ..... إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهِ...... وَإِذَا
اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ....وَاَعْلَمْ اِنَّ الأُمَّةَ لَوْ
اِجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْئٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ
إِلَّا بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ... وَإِنْ اِجْتَمَعَتْ عَلَى

أَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْئٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكَ، رفِعَتْ اِلأَقتلام، وَجَفَتْ الْصحَفُ-

আল্লাহর (হুকুম-আহকাম) সংরক্ষণ কর আল্লাহ তোমাকে সংরক্ষণ করবেন। আল্লাহকে মনে রেখ তাঁকে সামনে পাবে। সুখে তাঁকে চিনে রেখ, দুঃখে তাঁকে পাবে। কোন কিছু চাইলে আল্লাহর কাছেই চাও। সাহায্যকামী হলে তাঁর কাছেই হও। যদি সমগ্র মানবজাতি মিলেও কোন ব্যাপারে তোমার উপকার করতে চায় তাহলে আল্লাহর লিপিবদ্ধ ভাগ্য লিপির বাইরে কেউ তোমার কোনও উপকার সাধন করতে পারবে না। পক্ষান্তরে সমগ্র মানব জাতি মিলেও যদি কোন ব্যাপারে তোমার ক্ষতি সাধন করতে চায় তাহলে আল্লাহর লিপিবদ্ধ ভাগলিপির অধিক কোনও ক্ষতি সাধন করতে পারবে না তোমার। কলম (লেখা শেষে) উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। (লেখা শেষে) ভাগ্যের পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে। [তিরমিযী শরীফ হাদীস নং ৩৫১৮ : হিলইয়া ১/৩১৪]

ইবনে আব্বাস (রা.)কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত মেজাযে লালন করতেন। স্নেহসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর জ্ঞানগর্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রশ্নে নেহায়েত খুশি হতেন। মাঝে মধ্যে সেই খুশিটা প্রকাশ পেত তাঁকে বুকে জড়িয়ে সজোরে চাপ দেওয়ার মাধ্যমে এবং বলা কথা পুনরায় শুনিয়ে তাঁকে মুখস্থ করানোর মধ্য দিয়ে।

জিবরাঈল (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ভাগ্যই কেমন যেন আলাদা। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন। শৈশব-কৈশোরে এমন বিরল সম্মান ক'জনার ভাগ্যে জুটে! এমন সম্মানের মধ্যে একটি হচ্ছে ওহীর ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.)কে দর্শন। তাও আবার একবার নয়, দু'দুবার। আসুন, তাঁর মুখেই শোনা যাক। তিনি বলেন, আমি জিবরাঈল (আ.)কে দু'বার দেখেছি।

প্রথমবার তাঁকে দেখার সংবাদ দিচ্ছেন এভাবে–

আমি ও আমার বাবা একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে বসা ছিলাম। এ সময় আমার বাবা ও রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝে একটি পর্দা বা আড় দেখা দিয়েছিল। ইবনে আব্বাস (রা.) বাবার সাথে দরবারে নবুওয়াত থেকে বেরোনোর পথে বাবা বললেন আচ্ছা, তোমার চাচাত ভাই ও আমার মাঝের পর্দাটি লক্ষ্য করেছ কী?

ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, পর্দা কোথায় দেখলেন? পর্দা নয়, তিনি একজন লোক যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা বলেছিলেন।

: কী! তাঁর কাছে একজন লোক বসা ছিল?

জি হ্যাঁ।

হযরত আব্বাস (রা.) বিস্ময় প্রকাশ করে পুনরায় দরবারে নবুওয়াতে আসেন। বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এইমাত্র আপনার কাছে কোন লোক বসা ছিল? ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছে, একজন লোক ছিল। আপনি তাঁর সাথে কথা বলেছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবদুল্লাহ! তুমি তাঁকে দেখেছিলে?

ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, জি হ্যাঁ, দেখেছি!

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি জিবরাঈল (আ.)। [বেদায়াহ : ৮/২৯৭]

ইবনে আব্বাস (রা.) আরেকবার জিবরাঈল (আ.)কে দেখেছিলেন। যখন তাঁর বাবা কোন এক কাজে তাঁকে প্রিয়নবী (সা.)-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এক লোককে উপবিষ্ট দেখলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ফিরে গেলেন। নবীজী যেহেতু অন্য মানুষের সাথে আছেন সেদিকে লক্ষ্য করেই তার ফিরে আসা।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বাবার কাছে সে কথা বললেন।

পরবর্তীতে হযরত আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাত করতে এলেন। বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আবদুল্লাহকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছিলাম। আপনি কারও সাথে কথায় লিপ্ত থাকায় সে আপনার সাথে কথা বলার সুযোগ না পেয়ে চলে গেছে।

চাচাজান! ঐ লোকটা কে তা জানেন কী?

হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, না।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিনি জিবরাঈল (আ.)। জ্ঞান সমুদ্রের অতলান্ত গভীরে না পৌঁছা পর্যন্ত আপনার গুণধর পুত্রটির চোখের জ্যোতি যাবে না। [প্রাগুক্ত : ৮/২৯৮]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। ইবনে আব্বাস (রা.) মহাজ্ঞানী, জ্ঞানতাপস, বিদ্যাসাগর না হওয়া পর্যন্ত অন্ধ হননি।

শৈশবেই প্রাজ্ঞ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) শৈশবেই প্রাজ্ঞ হন। কারণ, তিনি এই বয়সেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য পেয়েছিলেন। নবুওয়তী প্রস্রবণী থেকে জ্ঞানের সুপেয় পানি পান করেছিলেন। তৃষ্ণা নিবারণ করেছিলেন আজলা আজলা হেকমত-রত্নের।

কেনই বা হবে না এই পরিপক্বতা? অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জ্ঞানের জগৎ উজ্জ্বল হবার দুআ করেছেন। তিনিই প্রথম শিশু সন্তান যাঁর পবিত্র পেটে নববী-লালা গেছে। শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে যেতে না যেতেই যখন তাঁর গলা থেকে তাবিজ খোলা হয়েছে, শিরে পাগড়ি ধারণ করা হয়েছে তখন থেকেই নববী তাজাল্লীর ছায়া ও জ্ঞানের আলোকচ্ছটায় তিনি ধন্য হয়েছেন।

এজন্যই সাইয়েদুনা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁকে প্রবীণ সাহাবাদের সাথে দরবারে খেলাফতে বসাতেন। তিনি উপস্থিত সাহাবাদের পাশাপাশি তাঁর থেকে রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ও সামাজিক শরয়ী বিধানের তাঁর পরামর্শের গুরুত্ব দিতেন।

একদিন হযরত উমর (রা.) তাঁর দরবারে বড় বড় সাহাবাসহ উপবিষ্ট। ইবনে আব্বাস (রা.)ও তাঁর আসনে উপবিষ্ট। এ সময় কয়েকজন সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দিকে ইশারা করে বললেন, বালকটি এখানে কেন? ও তো আমাদের সন্তানদের মত।

হযরত উমর (রা.) বললেন, তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্ব, বিস্ময়কর মেধা ও মর্যাদা তোমাদের অজানা নয়। খলীফা উমর (রা.) তাঁর ফকীহ ও উলামা সাহাবাদের ডেকে পাঠালেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আজকে হযরত উমর (রা.)-এর আহ্বান কেবল আমার জ্ঞানের জগৎ যতটুকু প্রসারিত– তা প্রকাশ করা। আমি কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে যতটুকু বিজ্ঞ তা সকলকে জানানো।

খলীফা বললেন, কুরআনের নিম্নোক্ত সূরার তাফসির সম্পর্কে কে কী জানেন?

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاس يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابَا-

যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে তখন আপনি দেখবেন মানুষেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে। অতএব, আপনি সপ্রশংসিত তাসবীহ পড়ুন ও ইস্তেগফার করুন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা গ্রহণকারী। [সূরা : নসর : ১-৩]

উপস্থিত কেউ কেউ বললেন, এ সূরার তাফসির হলো, আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর হামদ-ছানা গাইতে বলছেন, ইস্তেগফার করতে বলছেন। বিশেষ করে সাহায্য ও বিজয় যখন আসবে।

আবার অনেকে চুপও থাকলেন। কিছুই বললেন না।

এ সময় হযরত উমর (রা.) বললেন, তুমি কি এই তাফসিরে একমত ইবনে আব্বাস?

ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, না! আমি এ তাফসিরের সাথে ভিন্নমত পোষণ করি।

তাহলে তোমার তাফসির কি শুনি?

এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেওয়ার সংবাদ দিচ্ছেন। কেননা, নবীর আগমন মানুষকে দলে দলে

ইসলামে ঢুকানোর জন্য। সে উদ্দেশ্য যখন সাধিত হয়েই গেছে তখন আর নবীর দরকার কী? সুতরাং 'তাঁর সময় শেষ' এ কথাই সূরার মূল প্রতিপাদ্য।

হযরত উমর (রা.) হতবাক হয়ে বলেন, কসম খোদার! ইবনে আব্বাস! এমন অভিনব তাফসির তুমি ছাড়া আর কারও মুখে শুনিনি। [হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/৩১৭]

শৈশবে ইবনে আব্বাস (রা.) ছিলেন মিতভাষী। দরবারে উমর (রা.) প্রবীণ সাহাবায়ে কেরাম দ্বারা ঠাসা থাকতেও তিনি এই ব্যাঘ্র শাবকের হাত ধরে থাকতেন। শাবকটি বয়োকনিষ্ঠ কিন্তু জ্ঞানে গুণে সর্বশীর্ষে।

একবার উমর (রা.) একদল সাহাবাসহ দরবারে বসা ছিলেন। ওখানে লাইলাতুল কদরের দিনক্ষণ নিয়ে কথা উঠল। অনেকে এ নিয়ে কথা বললেন, কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা.) নিশ্চুপ ছিলেন।

হযরত উমর (রা.) বললেন, কি হে ইবনে আব্বাস! চুপচাপ বসে আছ যে, কিছু একটা বল। বয়োকনিষ্ঠ বলে কি চুপ থাকছ?

ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আমিরুল মুমিনীন! নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক বেজোড়, তিনি বেজোড় সংখ্যা ভালোবাসেন। জগতের সপ্তাহকে তিনি সাত দিনে সাজিয়েছেন। আমাদের রুজি তিনি সাত দিনেই নির্ধারণ করেছেন। আমাদের মাথার ওপর সাত আসমানের ছাউনি দিয়েছেন। পায়ের তলায় সপ্ত জমিন গেড়ে রেখেছেন। সূরা ফাতেহাকে সাত আয়াতে বিন্যস্ত করেছেন। কালামে পাকে নিকটাত্মীয়দের সাতজনকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লায় সাতবার তাওয়াফ করেছেন। সাফা-মারওয়ায় সাতবার সাঈ করেছেন। রমিয়ে জেমারও করেছেন সাতবার। এই পরিসংখ্যানে লাইলাতুল কদরকেও আমি রমযানের শেষ দশকের সাত তারিখে দেখছি।

উমর (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিনব ব্যাখ্যা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন। বললেন, এই বালকের ব্যাখ্যার মত সন্তোষজনক ব্যাখ্যা (লাইলাতুল কদর নিয়ে) আর কেউ দেয়নি। [প্রাগুক্ত]

জ্ঞান চর্চার প্রতি আকর্ষণ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঊর্ধ্বতন বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা.)-এর জ্ঞান চর্চা থেমে থাকলো না। তাতে ফল ধরলো। ফলে ফুলে সুশোভিত হল। তাঁর পরও তিনি প্রিয় ভাইয়ের তিরোধানে কাঁদলেন। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরহে শোক মাতম করলেন। তাঁর ইন্তে কালে কি-ই বা করার ছিল তাঁর। যিনি এ জগতে আসেন তিনি থাকতে আসেন না। চলে তাকে যেতেই হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম নন। ইবনে আব্বাস (রা.) শোক ভুলতে চেষ্টা করেন। শোককে শক্তিতে রূপ দেন। নববী জ্ঞানকে বিকশিত করতে সচেষ্ট হন। পত্র পল্লব দিয়ে একে মহীরূহ বানান। কেনই বা বানাবেন না? তাঁর মাঝে রেখে গেছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু যা আর কারও মাঝে রেখে যাননি। এমন দুআ তাঁকে করেছেন যা আর কাউকে করেননি। আল্লাহর হাবীবকে যতটুকু পেয়েছেন তাতে তাঁর থেকে নিতে ভুল করেননি কোনদিনও।

ইবনে আব্বাস (রা.) আরও জ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহী হলেন। নববী ইলমের যতটুকু তাঁর অজানা প্রবীণ সাহাবাদের থেকে তা জানতে উদ্যোগ নিলেন। আর এতে তিনি সর্বাগ্রে ইলমে কিরাতের প্রতি ঝুঁকে পড়লেন। হাতের লেখার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম আকর্ষণ। সেটিও হাতছাড়া করলেন না। বড় বড় সাহাবাদের থেকে শেখা জ্ঞান বিজ্ঞানকে কলমের আঁচড়ে লিখে যেতেই তাঁর হস্তলেখা শেখা।

তাঁর বর্ণনা– প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলে আমি জনৈক আনসারী সাহাবীকে বললাম, আসুন! প্রবীণ সাহাবীদের থেকে জ্ঞান চর্চা করি। সংখ্যায় তাঁরা ঢের বেশি। এ সংখ্যা তো কালক্রমে কমে যাবে।

আনসারী বললেন, অদ্ভুত ব্যাপার তো! ইবনে আব্বাস! তুমি কী মনে করো, মানুষেরা সকলেই তোমার মুখাপেক্ষী; অথচ প্রবীণ সাহাবাদের সকলেই বলতে গেলে এখন জীবিত?

ইবনে আব্বাস (রা.) এই আনসারীর কথায় হতাশ হলেও হতোদ্যম হলেন না। তিনি এঁকে ছেড়ে জ্ঞান চর্চার জন্য অন্যের দ্বারস্থ হলেন।

তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণিত হাদীসের সন্ধানে এমনও সাহাবীর বাড়িতে গিয়েছি যাকে গিয়ে ঘুমন্ত পেয়েছি। আমার জ্ঞানের চাদর তাঁর দরোজায় পেতে রেখেছি। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা আর বাতাসের ঝাপটায় ধুলাবালিতে আমার মুখ একাকার হয়েছে; তবুও হাদীস না শুনে ওখান থেকে ফিরিনি। বাড়িওয়ালা এক সময় আমাকে দরোজায় দেখে হতবাক হয়েছেন। তাঁর বিস্ময় ঝরে পড়েছে এভাবে– কী ব্যাপার, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই! তুমি এখানে?

একটি হাদীসের জন্য যা আপনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে থাকেন। ওটি **আমার** জানা নেই। শুনতে চাই সরাসরি আপনার মুখ থেকে।

আহ্হা! বুঝলাম হাদীস শুনবে, তা আমাকে ডেকে পাঠালেই পারতে!

না না। তা হয় কী করে! এ ক্ষেত্রে আমারই তো আপনার কাছে আসতে হয়। এ লোক আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসা দেখেছে। তাঁর সাথে আমার আত্মীয়তা জেনেছে। [সফওয়াতুস সফওয়াহ : ১/৭৫০]

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথা ও কর্মে তাঁর সহনশীলতা ফুটে ওঠে। ইবনে বুরায়দা বলেন, জনৈক ব্যক্তি তাঁকে গালি দিলেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, তুমি আমাকে গালমন্দ করলে অথচ আমার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে–

আমি আল্লাহর কালামের এমনও অনেকখানি জানি না, যা অন্যে জানে।

মুসলিম হাকিম থেকে অনেক সময় এমনও বিধান শুনি যা তারা নিতান্ত ন্যায়বিচারসম্মতভাবে প্রতিবিধান করে থাকেন। ওটা দেখে আমি প্রীত হই; কিন্তু ওই বিধান মোতাবেক সব বিচার আচারই আমি করি না।

আমি শুনি মুসলিম শহর নগর বর্ষণঘন মেঘে ছেয়ে যায়। এক সময় বৃষ্টি নামে। এতে আমি আনন্দিত হই। কিন্তু এতে আমার কোন চাহিদা নেই। [সফওয়াতুস সফওয়াহ : ১/৭৫৩]

অর্থাৎ আমি অজ্ঞ, অলস, উদাসীন ও নিঃস্ব। সুতরাং এরূপ একজন মানুষকে গালাগাল করলে তার এমন কি-ই বা যায় আসে!

এই হল সাইয়িদুনা ইবনে আব্বাস (রা.) ও তাঁর সহনশীলতা। গালির জবাব দিতেন সহনশীলতার মাধ্যমে, মূর্খতাকে জ্ঞানের মাধ্যমে। এই তাঁর প্রকৃতি, অভ্যাস ও চরিত্র।

মাইমুন বিন মেহরান বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা.)কে বলতে শুনেছি, কোন ভাইয়ের কথা আমার কাছে অপছন্দনীয় মনে হলে তাঁকে তিন স্তরের এক স্তরের মনে করতাম

এক. তিনি আমার চেয়ে বয়সে বড় হলে আমি তার মর্যাদা অনুধাবন করতাম।

দুই. তিনি আমার সমবয়সী হলে আমার ওপর তাকে প্রাধান্য দিতাম।

তিন. তিনি আমার চেয়ে বয়সে ছোট হলে তাকে গুরুত্ব দিতাম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইলমে নববী অন্বেষায় এবং তা একত্রীকরণে কখনোই অহংকার করেননি। যার কাছেই জ্ঞানের সুঘ্রাণ পেতেন তাঁর থেকেই শিখে নিতেন, হোক সে বড় কিংবা ছোট। স্বাধীন বা পরাধীন।

আবু রাফে যিনি রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদেম ছিলেন। তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণিত কিছু হাদীস কাষ্ঠখণ্ডে লিপিবদ্ধ ছিল। ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর থেকে তা সাগ্রহে সোৎসাহে সংগ্রহ করেন। এতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর জ্ঞান চর্চার প্রতি অকৃত্রিম আগ্রহ দেখে বিস্ময়বোধ করতেন। বলতেন, আমরা যা পেয়েছি তা যদি এই ছেলে পেত তাহলে আমাদের চেয়ে বহু বহু গুণে ঊর্ধ্বে উঠে যেত।

আলেমদের সহনশীলতা

সূর্য উঠলে মানব প্রকৃতি ও বিশ্ব চরাচর তার সৌররশ্মি পায়। মৃতপ্রায় জমিন পানির ছোঁয়া পেলে তার থেকে সবুজ পত্র-পল্লব উদ্গত হয়। আর হৃদয় যদি জ্ঞান-বিদ্যায় টইটম্বুর হয় তখন সে হয় সহনশীল। ইবনে আব্বাস (রা.) সব সময়ই এক জ্ঞানসূর্য ছিলেন, ঊর্বর জমি ছিলেন ও বিদ্যায় ভরপুর ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ছিলেন আলেম, আবেদ ও সহনশীল। খুব সহজে কথা বলতেন না। রূঢ় আচরণ কাকে বলে তিনি জানতেন না। জানবেন কী করে– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গৃহে যিনি লালিত, দরবারে নবুওয়াতে যিনি দীক্ষিত, উদারনৈতিক পরিবেশে যিনি পালিত; তাঁর পক্ষে রূঢ় আচরণ সম্ভবপর হয় কী?

এই আমার চরিত্র বৈচিত্র। যে এর প্রতি বিরূপ হবে আল্লাহ তার প্রতি খুশি হোন এবং তাকে প্রশস্ততা দান করুন।

তাঁর জিহাদ

ইলম চর্চা, গভীর অনুসন্ধিৎসা তাঁকে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করা থেকে বিমুখ করতে পারেনি। একই সাথে তিনি দুটিরই সমন্বয় সাধন করেছেন। কলমের কালি আর তলোয়ারের রক্ত উভয়টিতেই স্নাত হয়েছেন। অন্যের রক্ত যেভাবে ঝরিয়েছেন সেভাবে নিজের দেহ থেকেও রক্তপাত করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর স্বাতন্ত্র্য এখানেই। বিদ্বানও যে মুজাহিদ হতে পারে তিনি এর অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ।

ইবনে আব্বাস (রা.) চার দেয়ালে আটকা থাকার লোক নন। অচিরেই ময়দানে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি। অসংখ্য অগণিত যুদ্ধে নেমেছেন। আরবের ভেতরে বাইরে কোনটাই বাদ যায়নি। তিনি মিশর বিজেতাদের কাতারে ছিলেন। সায়াদ ইবনে আবু সিরাজ ছিলেন এর সেনাপতি। ঘটনাটি ২৭ হিজরির। তিরবিস্তান যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন যখন সে দেশের জনগণ মুসলমানদের সাথে মৈত্রী চুক্তি লঙ্ঘন করেছিল।

হযরত আলী (রা.)-এর সাথে তিনি জংগে জামালে যুদ্ধে নামেন। সিফফিনেও তিনি ছিলেন। নাহ্‌রাওয়ানে খারেজী বিদ্রোহ দমনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাঁর সাথে এসব যুদ্ধে সাহাবাদের বড় একটা অংশ শরীক ছিল। ইবনে উমর (রা.) ও ইবনে যুবায়ের (রা.) তাঁদের অন্যতম।

ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়া (রা.)-এর যুগে তিনি রোম যুদ্ধে শরীক হন। অনেক ধকল পেরোনো এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত কনস্ট্যান্টিনোপলে গিয়ে শেষ হয়। এটি ৪৬ হিজরির কথা।

তিনি নিজকে কেবল তলোয়ারের জিহাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। জিহ্বা ও কথার জিহাদও চালিয়েছেন আজীবন।

খারেজীদের সাথে তলোয়ারের যুদ্ধের পাশাপাশি বাকযুদ্ধ চালিয়েছেন। আমীর ওমরাদের পথনির্দেশমূলক কথার যুদ্ধও করেছেন। যারা খলীফাতুল মুসলিমীনের বায়াত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল তিনি তাদের প্রতি ধিক্কার ধ্বনি দেন। খলীফার পতাকাতলে শামিল হতে আহ্বান জানান। দলছুট হতে নিষেধ করেন। এমনিভাবে তিনি হাসান হুসাইন ও মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.)-এর মধ্যকার বিবাদ মীমাংসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এমনিভাবে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ও বনি উমাইয়ার মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে এগিয়ে আসেন।

মুজাহাদা ও ইবাদত

ইবনে আব্বাস (রা.) কেবল ইমামুল উলামাই ছিলেন না, কেবল মুত্তাকীনদের নেতা ছিলেন না; বরং ইবাদতকারীদেরও নেতা ছিলেন। এটি কেবল প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরেই নয়, শৈশব থেকেই তাঁর এই অবস্থা। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাড়িতে থাকতেই তাঁর এ সাধনা। নবীগৃহই ছিল তাঁর ইবাদতের সূতিকাগার, দীক্ষা গ্রহণের মাদরাসা। নববী হাতে গড়া, তাঁর প্রতিপালনে বেড়ে ওঠা ছেলে কেমন হতে পারে তা বলাই বাহুল্য।

ইবনু আবি মুলাইকা বলেন, মক্কা থেকে মদীনার পথে আমি ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সাহচর্য অবলম্বন করেছি। মধ্য রাতে যাত্রা বিরতিতে তিনি কুরআন তেলাওয়াতে লেগে গেছেন। তাসবীহ জপেছেন। ইবাদতের রাহে তামাম প্রিয়বস্তু উপেক্ষা করেছেন। হোক না সেটা তার চক্ষু।

খোদার ভয়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে এক সময় চোখ তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। অনেকে এ সময় তাঁকে আর কাঁদতে বারণ করতেন। চোখের যত্ন নিতে বলতেন।

একবার তাঁকে বলা হল, আপনার চোখ ভালো হতে পারে যদি পাঁচ দিন দাঁড়িয়ে নামায না পড়েন।

তিনি বললেন– এক রাকাতও বসে নয়। কেননা, আমিই হাদীস বর্ণনা করেছি–

مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً مُتَعَمِّدَةً لَقِى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ-

> যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এক রাকাত ছাড়বে, আল্লাহর কাছে গিয়ে সে তাঁকে রাগান্বিত পাবে। [সফওয়াহ : ১/৭৫৬]

খোদার ভয়ে দ্রুতই তাঁর চোখ বেয়ে পানি নামতো। অধিক অশ্রুপাতের দরুন দু'চোখের কোণে সরুরেখা পড়ে গিয়েছিল।

তাউস (রহ.) বলেন, আল্লাহর বিধানের প্রতি ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত এমন সম্মান প্রদর্শনকারী কাউকে দেখিনি। আল্লাহর নাম মুখে আনতেই তিনি কেঁদে ফেলতেন। সে রকম আমি কাঁদলে তোমরাও কেঁদে দেবে।

আবু রজা বলেন, ক্রন্দনের আতিশয্যে মনে হত তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে ঝর্নাধারা বইছে। [প্রাগুক্ত : ১/৭৫৬]

কাব্যজ্ঞান

ইবনে আব্বাস (রা.) কেবল কুরআন-হাদীসের জ্ঞানেই পটু ছিলেন না। কেবল 'ফিকহ্' আর এর 'উসুল' নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেননি

ইতিহাসের সন তারিখই কেবল চর্চা করেননি; বরং তিনি কাব্যজ্ঞানেও সুপণ্ডিত ছিলেন। ভাষা ও সাহিত্যেও অসাধারণ প্রজ্ঞাবান ছিলেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে যখন তখন কবিতা রচনা করতে পারতেন।

একবার মদীনায় কবি ও কবিতার সমালোচনার আসর বসলো। স্বয়ং খলীফা উমর (রা.) সেই আসরে সভাপতি ছিলেন। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রেষ্ঠ কবি কে?

আসরে মতানৈক্য শুরু হল। কেউ বললেন, ইমরুল কায়েস, আবার কেউ বললেন, নাবেগা। এ সময় ইবনে আব্বাস (রা.) আসরে প্রবেশ করলেন। হযরত উমর (রা.) বললেন, নাও, সর্ববিষয়ের সুপণ্ডিত এসে গেছেন। কবি ও কবিতার ব্যাপারে তাঁর মত আছেন ক'জনা?

হযরত উমর (রা.) এবার বললেন, শ্রেষ্ঠ কবি কে ইবনে আব্বাস?

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, শ্রেষ্ঠ কবি যুহাইর ইবনে আবু সুলমা।

উমর (রা.) বললেন, তাঁর কবিতার ক'চরণ শুনাতে পারবে কী?

ইবনে আব্বাস (রা.) তৎক্ষণাৎ যুহাইর'র কাব্য পাঠ করেন–

لَوْكَانَ يَقْعُدُ فَوْقَ الشَّمْسِ مِنْ كَرَمٍ قَوْمٌ بِأَجْسَا
مِهِمْ أَوْ جَبَلَدِهِمْ قُعُدُوْا-

قَوْمٌ أَبُوْهُمْ سُنَانٌ حِيْنَ يُنْسِبُهُمْ طَابُوْا وَطَابَ
مِنَ الْأَوْلَادِ مَا وَلَدُوْا-

সূর্যের উপরে যদি কোনও মর্যাদা থাকে
তাহলে জাতির দেহ ও তাঁর মর্যাদা তা।
জাতির পিতা সেনান যখন তার দিকে সম্বন্ধ করা হয়
তখন তারা খুশি, খুশি তাদের থেকে জন্ম নেওয়া সন্তানেরাও।।

হযরত উমর (রা.) বললেন, আল্লাহ পাক কবি যুহাইরের মুখ মাটি দ্বারা ভরে দেন। তার কথা সত্যিই চমকপ্রদ। তবে এই কথার বাস্তব প্রয়োগ 'সেনান' নয় বরং রাসূল খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আহলে বাইতই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

রোম সম্রাটের প্রশ্নের জবাব

ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্ব দ্বারা আমীরে মুআবিয়া (রা.)-এর নিকট বিশেষ মর্যাদা পেয়েছিলেন। তিনি তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন, কাছে ডাকতেন ও গুরুত্ব দিতেন। তাঁর থেকে জটিল সমস্যার সমাধান ও অজ্ঞাত বিচারনীতি জেনে নিতেন।

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মর্যাদা তাঁর কাছে বেশি হবার আরও একটি উপলক্ষ এসে দাঁড়ায়। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা আঁচ করার সুযোগ হাজির হয় যখন রোম সম্রাট আমীরে মুআবিয়া (রা.)-এর কাছে কিছু প্রশ্ন প্রেরণ করেন। তিনি মনে করেন, মুসলমানরা এসব জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। অথচ মুআবিয়া (রা.) তাঁদের মাঝে বিদ্যমান। তার ধারণা, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমীরে মুআবিয়া (রা.) পারবেন না। এতে প্রজাদের মধ্যে তাঁর মর্যাদাহানি হবে। তাই তিনি খুব আশা করে মুসলিম জাতিকে বিপাকে ফেলার জন্য প্রশ্ন প্রেরণ করেন। রোম সম্রাট সর্বমোট সাতটি প্রশ্ন করেন।

আসুন, প্রথমে সেই প্রশ্ন সাতটি জেনে নেয়া যাক।

১. আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় কালাম কোনটি?

২. আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বান্দা কে?

৩. আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রমণী কে?

৪. কোন চারটি প্রাণী মাতৃজঠর ছাড়াই জন্ম নিয়েছে?

৫. কোন কবর তার ভেতরকার লাশ নিয়ে ছুটোছুটি করেছে?

৬. ভূ-পৃষ্ঠের কোন অংশ যেখানে মাত্র একবার সৌররশ্মি পৌঁছেছে?

৭. 'কোস কাযা' কী? আর 'মাযা' কাকে বলে?

আমীরে মুআবিয়া (রা.) পত্র পাঠ করে প্রমাদ গুনলেন। তাঁর প্রবল ধারণা, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত ভূ-পৃষ্ঠে একজনই আছেন। তিনি বিদ্যাসাগর, ইমামুদ দুনিয়া, জ্ঞান সম্রাট, জ্ঞান-বিদ্যার কেল্লা সাইয়েদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)।

আমীরে মুআবিয়া (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে পত্র প্রেরণ করেন। তাতে এই প্রশ্নগুলো লিখে উত্তর সংযোগ করে দেওয়ার অনুরোধ জানান।

ইবনে আব্বাস (রা.) উত্তর লিখেন–

১. আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কালাম, সুবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

২. আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বান্দা সাইয়েদুনা আদম (আ.)। কেননা, তাঁকে তিনি কুদরতী হাতে পয়দা করেছেন। তাঁর নিথর দেহে প্রাণের সঞ্চার করেছেন। ফিরিশতা দিয়ে তাঁকে সিজদা করিয়েছেন এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুর নাম শিখিয়েছেন।

৩. আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রমণী হযরত মরিয়ম বিনতে ইমরান (আ.)।

৪. মাতৃজঠর ছাড়া জন্ম নেয়া চার প্রাণী যথাক্রমে, হযরত আদম (আ.), হযরত হাওয়া (আ.), মুসা (আ.)-এর লাঠি ও ইবরাহিম (আ.)-এর দুম্বা যা ইসমাঈল (আ.)-এর স্থলে কুরবানী দিয়েছিলেন।

৫. ইউনুস (আ.)-এর মাছের পেটই সেই কবর যা তার ভেতরকার লাশ নিয়ে ছুটোছুটি করেছে।

৬. মুসা (আ.) সাগর বক্ষের যেখানে লাঠি নিক্ষেপ করে রাস্তা বানিয়ে বনী ইসরাঈলকে পার করিয়ে নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, লাঠি নিক্ষেপের দরুন ওখানটার পানি সরে গিয়েছিল আর তখন একবারই ওখানে সৌররশ্মি পড়েছিল। ঘটনাটি দিনের বেলায়ই ঘটেছিল।

৭. 'কোস কাযা' হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠবাসীর ডুবে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচার মাধ্যম। আর 'মাযা' হচ্ছে আকাশের একটি দরোজার নাম।

এই উত্তরনামা রোম সম্রাটের কাছে পৌঁছার পর তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বললেন–

وَاللهِ مَا هِىَ مِنْ عَنَّدَ مُعَاوِيَةَ، وَلَامِنْ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا هِىَ مِنْ عِنْدَ اَهْلِ النَّبِيِّ صلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-

'কসম খোদার! এ উত্তর মুআবিয়ার নয়। নয় এ তার কথাও। নিশ্চয়ই এটি নবী পরিবারের কোন সদস্যেরই হবে।' [হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/৩২১, বেদায়াহ-নেহায়াহ : ৮/৩০৩]

শিষ্টাচার

যেসব মহামানব জ্ঞানান্বেষী হন, ভদ্রতা শিখেন, জ্ঞানীদের আসরে বসেন, তারা মূলত জ্ঞানী-গুণীজনের মূল্যায়ন উপলব্ধি করেন। আত্মবিনাশনপূর্বক তাঁদের সাথে বিনম্র হন, হন শিষ্টাচারী। তাঁদের নৈকট্যের মাঝেই আপনার অস্তিত্ব খোঁজেন। তাঁদের কথায় প্রীত হন।

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ব্যক্তিত্ব, বংশ, আত্মমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব যা, তাতে তিনি আলেম-উলামার আদর্শিক পৌরুষ। আহলে বাইত হয়েও তিনি আলেমদের প্রতি যারপরনাই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ছিলেন বদান্য।

সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস (রা.) যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর জ্ঞানগত গভীরতা ও অসামান্য পাণ্ডিত্বের কথা জানতেন। এজন্য তাঁকে মর্যাদার উঁচু আসনে বসাতেন, শ্রদ্ধা করতেন, খুব কাছটিতে থাকতেন, যেমন খুশি তেমন জ্ঞান চর্চা করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর প্রিয় ওস্তাদের কাছে আসতেন। তিনি যে বাহনে চাপতেন নিজ হাতে তার লাগাম ধরতেন। হযরত যায়েদ (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.)কে অন্তত এ কাজটি করতে বারণ করতেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, আলেমদের প্রতি এমন আচরণ করতেই আমরা আদিষ্ট।

হযরত যায়েদ (রা.) বলতেন, তোমার হাতটা দাও দেখি...? ইবনে আব্বাস (রা.) হাত বের করে দিলে তিনি হস্ত চুম্বন করে বলেন, আহলে বাইতের প্রতি এমন আচরণ করতেও আমাদের নির্দেশ দেওয়া আছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মহান সাহাবী যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর বাড়িতে আসতেন। তিনি বলতেন, ইলম কষ্ট করে অর্জন করতে হয়। এটি কখনও এমনিতে আসে না– আনতে হয়। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর প্রবল ধারণা ছিল, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) ছিলেন অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর কথা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান ও প্রবীণ সাহাবাদের অভিমত যে, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) জ্ঞানে-গুণে বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী, গভীর বুৎপত্তিসম্পন্ন ও প্রাজ্ঞ ছিলেন।

হযরত যায়েদ (রা.) ইন্তেকাল করলে ইবনে আব্বাস (রা.) শোকাহত হন। তাঁর সমাধি তীরে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ফেলেন।

তিনি বলেন, ইলম কিভাবে দুনিয়া থেকে উঠে যায় সেটি যদি কারও দেখতে হয় তাহলে সে যেন এই মহাত্মাকে তুলে নেওয়ার মাঝে দেখে নেয়। (অর্থাৎ আলেমদের মৃত্যুতে ইলম উঠে যায়)।

সাহাবা ও তাবেঈনের প্রশংসা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী করেছিলেন। অনিঃশেষ জ্ঞান সমুদ্রে বিচরণ করিয়েছিলেন। দেখিয়েছিলেন চিন্তা-চেতনার অতলান্ত মহী সোপান, প্রত্যুৎমন্না ও কালোত্তীর্ণ ব্যক্তিত্বে রূপদান করেছিলেন।

তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, তিনি ছিলেন মৌচাক, যাকে ঘিরে থাকে হাজারো মধু মক্ষিকা, হাজারো ফুলের ঘ্রাণ এই চাক-এ। স্বাদই আলাদা এখানকার, পুষ্পকলির সৌরভে এখানটা মাতোয়ারা। তাঁর যতই মহিমা কীর্তন করা হোক না কেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিত্বের শানে কমই অনুমিত হবে। তিনি ইমাম, সাগর, মহাসাগর, প্রাজ্ঞ, কুরআনের মুখপাত্র, ইলম ও মারেফাতের ভাণ্ডার, নববী উৎসধারার প্রতিনিধি। সব সাহাবা ও তাবেঈন এসবের স্বাক্ষী।

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)কে দিয়েই শুরু করা যাক তাঁর মহিমা কীর্তন– তিনি বলেন–

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَضْرَمُهَا، وَلَا أَلَبُّ لُبًّا، وَلَا أَكْثَرُ عِلْمًا وَلَا أَوْسَعُ حِلْمًا مِنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-

> উপস্থিত জ্ঞান, অসামান্য পাণ্ডিত্ব, গভীর ও বিশাল জ্ঞান, সুপ্রশস্ত সহনশীলতায় ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত কাউকে দেখিনি। [বেদায়াহ-নেহায়াহ : ৮/৩০০]

ওবাইদুল্লাহ ইবনে ওতবা বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.)কে হারিয়ে মানুষ অনেক কিছুই হারিয়েছে। মানব জাতিকে তিনি সৃজনশীল মতাদর্শ উপহার দিয়েছেন, হারানো জ্ঞান পুনরুদ্ধার করেছেন, আধুনিক-পৌরাণিক আসমানী ইলমের সমাহার করেছেন। হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রে তাঁর মত প্রাজ্ঞ কাউকে দেখিনি। আবু বকর (রা.), উমর (রা.) ও উসমান (রা.) বিচার-আচারের বিকল্প প্রতিভূ ছিলেন তিনিই। তাঁর কাছে জ্ঞানের সমাধান চাইতে দেরি যতটুকু, সমাধান পেতে ততটুকু নয়। আমরা তাঁর কাছে বসেছি, রাতের পুরোটাই কাটিয়ে দিয়েছেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুদ্ধপর্ব আলোচনায়। কখনও বা রাত কেটে গেছে বংশনামা আলোচনায়। কোন কোন রাত কেটে গেছে কবি ও কবিতার বিদগ্ধ সমালোচনায়।

* হযরত আবু ওয়ায়েল (রহ.) বলেন, কোন এক হজ মওসুমে তাঁকে আমীরে হজ বানিয়ে দেয়া হয়। তিনি আমাদেরকে সূরা নূরের তেলাওয়াত ও তাফসির শোনান। আমি বলি, তাঁর মত তাফসির আর কেউ করেছেন কি না জানি না। আমি অন্তত জানি না। পারস্য ও তুরস্কের মানুষেরা এই বক্তব্য ও সারগর্ভ তাফসির শুনলে মুসলমান হয়ে যেত।

* হযরত মাসরূক (রহ.) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর চেহারার দিকে তাকালে বলতাম, তিনি সৌন্দর্য গুণে সেরা, কথা বললে বাগ্মী, হাদীসের পাঠদান করলে মহাপণ্ডিত। পরে বলেন, কুরআনের আয়াত তাঁর সমীপে পেশ করা হলে তিনটি বিষয়ই সাধারণত জানতে চাওয়া হত। প্রতিবারই তাকে বলা হতো, এর শানে নূযুল কী? ব্যাখ্যা ও মানে মতলব কী? মর্ম, তত্ত্ব ও তথ্য কী?

* হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আসরে আমি কখনোই কোন অনৈতিক কাজ হতে দেখিনি।

* তাঊস (রহ.) বলেন, আমি পাঁচ শতাধিক সাহাবীর সাহচর্য লাভ করেছি। তাঁরা কোনও ব্যাপারে ঠেকে গেলে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর শরণাপন্ন হতেন।

* হযরত আবু মুলায়কা (রহ.) বলেন, তাফসিরকার মুজাহিদকে দেখেছি তিনি ইবনে ইবনে আব্বাস (রা.)কে কুরআন তাফসির জিজ্ঞেস করছেন আর কাঠে লিখে রাখছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁকে বলছেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সবই লিখে রাখো। তাফসিরের কোনদিকই যেন বাদ না যায়। [বেদায়াহ-নেহায়াহ : ৮/৩০০, ৩০১, ৯/২২৪]

* ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (রা.) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত সর্বগুণে গুণান্বিত কেউ আমার নজরে পড়েনি।

* সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.) শ্রেষ্ঠতর আলেম।

* সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহ.) বলেন, তিনি আমার হাদীসের গুরু। অনুমতি পেলে তাঁর পবিত্র মাথায় ঠোঁট ছোঁয়াতাম। [প্রাগুক্ত : ৯/৯৭]

* মুজাহিদ বলেন, গভীর জ্ঞানে সুপণ্ডিত হবার দরুন তিনি জ্ঞান-বিদ্যার চলন্ত একাডেমী। [সফওয়াতুস সফা : ১/৭৫৩]

ইন্তেকাল

ইবনে আব্বাস (রা.) যখন দেখলেন খেলাফতের জীবন প্রদীপ নিভু নিভু হয়ে আসছে তখন তিনি তায়েফে অবস্থান গ্রহণ করলেন। জীবনের বাকী দিনগুলো এখানেই কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। কেননা, তায়েফ শান্ত নগরী, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, মনোমুগ্ধকর এখানকার পরিবেশ।

তিনি তায়েফে এলেন। চারদিক থেকেই জ্ঞানপিপাসুরা ছুটে এল তাঁর কাছে। শেষ বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। বয়স ৭০-এর

কোটা ছাড়িয়ে যায়। এক সময় ওপারের ডাক এসে পড়ে। তিনি প্রকৃত মাওলার ডাকে চলে যান। মানুষেরা শোক সাগরে ভেসে যায়।

মাইমুন বিন মেহরান বলেন, তায়েফে আমি ইবনে আব্বাস (রা.)-এর জানাযায় শরীক ছিলাম। যখন তাঁর লাশ মোবারক জানাযার জন্য উঠানো হয় তখন শূন্য থেকে শ্বেত-শুভ্র কিছু পাখি তাঁর কাফনের ভেতর ঢুকে পড়ে। পাখিগুলো পরে তালাশ করা হয়েছে। কিন্তু পাওয়া যায়নি। যখন তাঁকে মাটির নীচে শুইয়ে দেয়া হয়েছে তখন শূন্যে শোনা গেছে এই আয়াতসমূহ, কিন্তু তেলাওয়াতকারী কে তা জানা যায়নি–

يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ! ارْجِعِىْ إِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ (سورة الفجر-٢٧ - ٣٠)

হে পবিত্র আত্মা! সন্তুষ্টচিত্তে তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও। আমার নেক বান্দাদের মাঝে অনুপ্রবেশ কর। প্রবেশ কর আমার জান্নাতে। [সূরা ফজর : ২৭-৩০]

رضى الله عنه ورضوا عنه

স মা প্ত

কিশোর কানন

হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.)

আমাদের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দশজন বিখ্যাত সাহাবীর কিশোরকালের সোনালী জীবন নিয়ে কিশোর কানন সিরিজের যাত্রা শুরু হলো। এ সিরিজের আওতায় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সাহাবী, তাঁর সংগ্রামী বিবি-কন্যাগণ, বিখ্যাত মহিলা সাহাবী, উল্লেখযোগ্য শুহাদায়ে সাহাবাসহ পুণ্যময় ইসলামী মনীষীগণের শিশু-কিশোর জীবনী সহজ সরল গদ্যে, গাল্পিক ভঙ্গিমায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

আমাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। বাংলা ভাষায় শিশু-কিশোরদের উপযোগী বই-পুস্তকের সংখ্যা এমনিতেই কম। যাও বা আছে, তা তথ্য ও বানান বিভ্রাটের পাশাপাশি নানাবিধ পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। বড়দের বইয়ের তুলনায় শিশুদের বইয়ে ভুল থাকার অপরাধ অবশ্যই বড়। কেননা যেসব পঠন সামগ্রীর মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মেধা মনন শানিত হবার কথা, তাতে যদি ভুল ও তথ্য বিভ্রাট থাকে তাহলে তা হবে হিতে

বিপরীত। সোনালী যুগের সোনালী মানুষের জীবন অধ্যয়নের মধ্যেই শিশু-কিশোরদের সত্যিকার মানসিক বিকাশ লাভ সম্ভব। তাই এ সিরিজের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ছেলেবেলাকেই প্রাধান্য দিয়েছি। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে সম্পর্কিত মানুষজনের চেয়ে আলোর পথের কাফেলা আর কোথায় মিলতে পারে?

আমরা বুকভরা আশা নিয়ে আলোর পথের যাত্রী মহান মনীষীদের ছেলেবেলা আজকের শিশু-কিশোরদের সামনে তুলে ধরছি। আমাদের বিশ্বাস, এ বইগুলো পাঠে শিশু-কিশোররা সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার খোরাক পাবে। পরকালের সফলতার লক্ষ্যে দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর সহজ সরল ঈমানদীপ্ত পথে তুলে আনতে এ সিরিজের প্রতিটি বই ছোটদের পাশাপাশি বড়দেরও কাজে আসবে আশা করি। ঈমান-জাগানিয়া এসব মহান মনীষীর জীবন প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহ দরবারে শুকর আদায় করছি। এ সিরিজের বইগুলো পড়ে একজন মানুষও যদি আলোর পথের সন্ধান পান তবেই আমাদের শ্রম সার্থক মনে করবো।

বইগুলো নির্ভুল করাসহ সর্বাত্মক সুন্দর করতে আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। তথাপি মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। কারও চোখে কোন ভুল বা অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের জানালে

পরবর্তী সংস্করণে কৃতজ্ঞতার সাথে তা শোধরে নিতে সচেষ্ট থাকবো, ইনশাআল্লাহ। শিশু-কিশোরদের নিয়ে আরও বড় কাজ করার ইচ্ছা আমাদের আছে। তওফিকের মালিক মহান আল্লাহ। লেখকসহ বই প্রকাশে যাদের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি মহান আল্লাহর কাছে সকলের শ্রমের উত্তম প্রতিদান প্রার্থনা করছি। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

তারিখ
১ আগস্ট ২০০৭

বনীত
মাসুম বিল্লাহ

কিশোর কাননের কয়েকটি বই

- হযরত আবদুলাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ◄
- হযরত আবদুলাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) ◄
- হযরত আবদুলাহ ইবনে জাফর (রা.) ◄
- হযরত আবদুলাহ ইবনে আমর (রা.) ◄
- হযরত আবদুলাহ ইবনে উমর (রা.) ◄
- হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) ◄
- হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) ◄
- হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রা.) ◄
- হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) ◄
- হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.) ◄

বংশ পরিচয়

তিনি সাঈদ ইবনুল আস ইবনে আবি উহাইয়াহ। কুরাইশ তাঁর বংশ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঊর্ধ্বতন পুরুষ আবদে মানাফের সাথে তাঁর বংশধারা মিলিত হয়।

তাঁকে 'ছোট সাঈদ' বলা হয়। 'বড় সাঈদ'-এর সাথে পার্থক্য করতে গিয়ে। হাদীসবেত্তারা দু'সাঈদের মাঝে পার্থক্য সূচিত করতে এই 'ছোট' 'বড়' শব্দ দুটি তাদের নামের শুরুতে অন্তর্ভুক্ত করেন।

তাঁর মা উম্মে কুলসুম বিনতে আমর। তিনিও কুরাইশী। অভিজাত ঘরানার মেয়ে।

বাবার ইসলামবৈরিতা

সাঈদ (রা.)-এর বাবা আসের ইসলামবৈরিতা মক্কার সকলেই জানতো। দারুন নদ্ওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা পরামর্শে সে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। সেই-ই গোটা মক্কায় মুসলিম নির্যাতনের প্ল্যান করতো। প্রিয়নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের প্রতি তাঁর আক্রোশ ছিল সর্বাধিক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম যখন মদীনা হিজরত করেন তখন কুরাইশীরা দাঁতহীন গোখ্‌খুরের মতো ফোঁসফাস করে। এরই ফলশ্রুতিতে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আস মুসলমানদের বিরুদ্ধে বদরে তলোয়ার ধারণ করে। দ্বৈতযুদ্ধে শরীক হয়। হযরত আলী (রা.) তাকে হত্যা করেন।

ভালোবাসা ও মুক্তি

মক্কায় শীর্ষস্থানীয় নেতারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা স্থাপন করে। এতে মুসলমানরা দুর্বল হয় না; বরং তাঁদের শক্তি বেড়েই চলে। মুশরিকরা তাই নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

মক্কার পরিবেশ যখন মুসলিম জাতির জন্য শত্রুতায় ভরা তখন তাঁদের প্রতি মমতাবোধ স্থাপন করেন ছোট্ট একটি শিশু। তাঁর কচিমন কেঁদে ওঠে কুরাইশীদের বিরুদ্ধে। জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি ফুঁসে ওঠেন। বাবার বিরুদ্ধে দাঁত কটমট করেন। কচি চোয়াল দুটি শক্ত করেন। তিনি মনে করেন, এই অপরাধ অসহ্য। এই জুলুম অকথ্য। মানবতাবিরোধী। কিন্তু তিনি কি-ই-বা করতে পারেন? একটি পথই তাঁর সামনে খোলা। ঘরদোর ছেড়ে পালানো এবং মদীনা চলে যাওয়া। হকের পক্ষে বাতিলের বিরুদ্ধে এটুকু ছাড়া তাঁর আর কিছুই করার নাই।

তাঁর বাবা আস বদরে নিহত হয়। শিশুপুত্রটি তখন মক্কায়। মক্কায় বসে কাফেরদের পতন আর বাবা মারা যাওয়ায় তিনি দুঃখের স্থলে খুশিই জাহির করেন। তিনি মনে করেন, যথার্থই

এই পরাজয়। কিন্তু আনন্দ-উল্লাস করার পরিবেশ মক্কায় নেই। বিজয় মিছিলে শামিল হওয়ার সুযোগ নেই। উপায়ন্তর না দেখে শিশু সাঈদ মক্কা ছেড়ে মদীনায় নীত হন। মদীনা এসে দরবারে নবুওয়াতে পড়ে থাকেন। ওহীর ঝর্নাধারা থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করেন। নিজে শিখেন অরপকে শেখান।

সহাবায়ে কেরাম তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেন : তিনি নেতা, অভিজাত, দাতা, সহনশীল, প্রভাবশালী, বাকপটু। আরবি কুরআন যেন তাঁর ভাষাতেই নাযিল হয়েছে। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চারণভঙ্গি তিনি নকল করতে পারতেন। আরও একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর, তা হচ্ছে এই যে, উসমান (রা.)-এর কুরআন সংকলন বোর্ডের তিনি একজন কার্যকরী সদস্য।

সাঈদ (রা.)-এর পক্ষে প্রিয়নবী (সা.)-এর সাক্ষ্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে নবুওয়াতে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে ওয়াজ করছিলেন। সেখানে অসংখ্য সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় জনৈকা নারী উপস্থিত হলেন এবং সালাম দিলেন। সাহাবারা তাঁর সালামের জবাব দিলেন। তিনি একটি মোটা চাদর নিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আরবের শ্রেষ্ঠ ও অভিজাত কাউকে এই চাদরটি আমি দান করতে চাচ্ছি।

সাহাবায়ে কেরামের চক্ষু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারায় নিবদ্ধ। তিনি কাকে চাদর দেন? যাকে দেবেন সে তো শ্রেষ্ঠ ও অভিজাত হয়ে যাবে। সকলের কামনা রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন তাকেই নির্বাচন করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত সাহাবাদের প্রতি দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন। সবশেষে সাঈদ ইবনুল আসের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই ছেলেটিকেই চাদরটি দাও।

সাঈদ (রা.)-এর জন্য এটুকু সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তাঁর বয়স এখনও দশের কোঠা পেরোইনি। শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা আভিজাত্যেরও আহামরি কিছু তখন তাঁর থেকে বেরোয়নি। অথচ দরবারে নবুওয়াত থেকে আভিজাত্যের আগাম স্বীকৃতি। ভাবা যায়, ব্যাপারটি কত চমকপ্রদ!

বিরহ বেদনা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধানে হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.) খুব শোক পেলেন। খুব কাঁদলেন। তাঁর সাথে কাটানো সোনালী মুহূর্তগুলো ছিল শ্রদ্ধা-স্নেহ বিনিময়ে ভরা। মক্কার এ দুরন্ত কিশোরকে তিনি একান্ত নিজের করে নিয়েছিলেন। বাপ-মা ছেড়ে আসার কথা তাঁকে ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নিজকে আল্লাহর দীনের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। দীনের প্রতি তাঁর এ এক অপূর্ব ত্যাগ-তিতিক্ষা। মক্কা ছেড়ে মদীনা এসে এক মহান জাতির কাছে মহাদীক্ষা পেয়েছিলেন। ধন্য এ শিশুপুত্র। পুলকিত এ কিশোর সাহাবী।

সাঈদ ও আবু বকর (রা.)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা.) খেলাফতের মসনদে আসীন হন। তাঁর

দ্বারা ইসলামের সুমহান খেদমত হয়। মুসলমানেরা তাঁকে অকুণ্ঠ সাড়া দেয়। সাঈদ (রা.) থাকেন এঁদের শীর্ষে। বায়াত বিষয়ে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বয়স এ সময় তাঁর মাত্র বার। খলীফা তাঁর বীরত্ব ও পরিপক্বতায় মুগ্ধ। তিনি এ বয়সেই তাঁকে তাই বড় কোন নেতৃত্ব দেয়ার মনস্থ করেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যারা দীন শিখেছেন সাঈদ (রা.)কে সে দলে ভিড়তে তিনি পরামর্শ দেন। আরও পরামর্শ দেন যারা নওমুসলিম তাঁদেরকে সহীহ আকীদা শেখানোর।

খলীফার সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা ছিল, নওমুসলিমের এক দলের মুরতাদ হয়ে যাওয়া। এরা অবশ্য ভণ্ড নবীদের দলভুক্ত হয়নি। খলীফার প্রচেষ্টায় তারা পুনরায় ইসলামে ফিরে এসেছিল। সকলে আসেনি। তাই না আসা দলটির উদ্দেশে সৈন্য প্রেরণ করতে হয়েছিল।

একই সময়ে এগারটি ক্ষুদ্র দল বানাতে হয়েছিল। আরবের কোণে-প্রান্তরে এদের প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রতিটি ক্ষুদ্র দলকে বলা হয়েছিল, তারা যেন ইসলাম অস্বীকৃতি ছাড়া কাউকে হত্যা না করে।

সিরিয়ার নেতৃত্ব

সাঈদ ইবনুল আস (রা.) সেসব ক্ষুদ্র সেনাপতিদের একজন যাদেরকে দেশের বিভিন্ন প্রদেশে মুরতাদদের দমনে প্রেরণ করা হয়েছিল। সিরিয়া প্রাচীনকাল হতেই শিক্ষিত ও অভিজাতগণের বেলাভূমি। সুতরাং এখানে কোন সেনাদল প্রেরণ করতে হলে জেনে বুঝেই পাঠাতে হবে। খলীফার কাছে সাঈদের মর্যাদা ছিল,

আস্থা ছিল। হোক না তাঁর বয়স কম– তাতে কী! ঈমানের বল, যুদ্ধপটুতা ও দীন-আকীদার পরিপক্বতায় তো আর তিনি কম নন।

তিনি ইসলাম প্রচারে তাঁর সর্বস্ব ব্যয় করতে চাচ্ছিলেন। এতে তাঁর সুগভীর যোগ্যতা, ইসলামের প্রতি অগাধ আগ্রহের দিকটাই ফুটে ওঠে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সেদিনই চিনতে পেরেছিলেন যেদিন জনৈকা নারী চাদর দানের জন্য অভিজাত কাউকে খুঁজছিলেন। তিনি সেদিন এই সাঈদ (রা.)কেই চাদরটি দেয়ার কথা বলেছিলেন।

সাঈদ (রা.) তাঁর সময়কে নেতৃত্বের মাঝেই ব্যয় করতে চাচ্ছিলেন। শত্রুর ওপর প্রাধান্য ছিল নেশা। তিনি সঠিক নেতৃত্ব দ্বারা অধীনস্থদের মুগ্ধ করেছিলেন। সবশেষে ফিরে এসেছিলেন মদীনায়।

সাঈদ (রা.) ও উমর (রা.)

সাঈদ ইবনুল আস (রা.) সর্বদা তাঁর কাজ নিয়ে ভাবতেন। নিত্য-নতুন পরিকল্পনা আঁটতেন। দর্শক দেখত তিনি কর্মব্যস্ত– কারও সাথে দেখা করার জো নেই। কথা বলার সময় নেই।

একবার তিনি খলীফা উমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করতে এলেন। উমর (রা.) বললেন–

কি হে, সাঈদ উবনুল আস নাকি?

হ্যাঁ, আমিরুল মুমিনীন! সাঈদ (রা.) বললেন।

ব্যাপারটি বলতো, তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছো কেন? ওহ্ হো! বদর প্রান্তরে তোমার বাবাকে হত্যা করেছিলাম, তাই বুঝি?

: না আমিরুল মুমিনীন! সে জন্য না।

যদি তোমার পিতৃহন্তাকে খুঁজতে যাও তাহলে জেনে নাও হযরত আলী (রা.)ই তিনি। আমি স্রেফ আমার মামাকে নিজ হাতে হত্যা করেছিলাম।

হযরত সাঈদ (রা.) বললেন : আমিরুল মুমিনীন! তাঁকে হত্যা করলেও তো আপনার গুনাহ হবার কথা নয়। কেননা, যুদ্ধের মাঝে প্রতিপক্ষকে হত্যা করার মাঝে কোনও গুনাহ নেই। আর আমার বাবা তো বাতিলপন্থী ছিলেন। সুতরাং এ নিয়ে আমার যেমন ভাবনা নেই তেমনি ভাবনা থাকা উচিত নয় আপনারও।

হযরত সাঈদ (রা.)-এর এমন নির্ভীক উত্তরে আমিরুল মুমিনীন যারপরনাই খুশি হলেন। তিনি সত্যিই অনুধাবন করতে পারলেন তাঁর ঈমান কতটা মজবুত। শিক্ষা পরিপক্ব ও দীনের প্রাধান্য সবার চেয়ে ঊর্ধ্বে।

অধিক ও প্রশস্ত

কথিত আছে, একবার হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.) খলীফা উমর (রা.)-এর দরবারে এলেন। তাঁর কাছে মদীনায় প্রাপ্ত জমি একটু প্রশস্ত করে দিতে বলেন।

হযরত উমর (রা.) বলেন, আগামীকাল দেখা করো... দরবারে এসে স্মরণ করিয়ে দিও।

হযরত সাঈদ (রা.) বলেন, আমি নামায আদায় করে তাঁর কাছে এলাম। আসার পরে যা দেখলাম তাতে মনে হলো, তিনি আমার কথা বেমালুম ভুলেই গেছেন। অন্য কাজে লেগে গেছেন। আমাকে কোনও কথা জিজ্ঞেস করছেন না। এ সময় আমি

বললাম, আমিরুল মুমিনীন! আমার প্রয়োজন আপনাকে গতকালের আর্জি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। বলবো কি সেই আর্জি?

খলীফা বললেন : বলো। তিনি বললেন। তাঁকে নিয়ে জমির কাছে গেলেন। পা দ্বারা চৌহদ্দি দিয়ে দিলেন। বললেন, সাঈদ! এই চৌহদ্দি পর্যন্ত তোমার বাড়ির জায়গা বর্ধিত করে নাও।

হযরত সাঈদ (রা.) বলেন : খানিক বাড়িয়ে দিন না। কেননা, আমার পরিবার-পরিজন আগামীতে বাড়তে পারে।

হযরত উমর (রা.) বললেন : তোমাকে যা দিয়েছি তাই যথেষ্ট। লাগলে আগামীতে দেখা যাবে। আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রেখো। আল্লাহ তোমার কাজে বরকত দেবেন। ঠেকা পুরণ করবেন।

জিহাদ

সিরিয়া যুদ্ধে তিনি অন্যতম সেনানী ছিলেন। এটি রোম সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত করদরাজ্য ছিল। রোমানরা একে পদানত করে রেখেছিল। সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদল বেশ কিছু সেনাপতির তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করা হয়েছিল। সেনাপতিরা যথাক্রমে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.), আমর ইবনুল আস (রা.), ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.), শুরাহবিল ইবনে হাসানাহ (রা.)। এঁরা রোমশক্তির দম্ভের সুউচ্চ চূড়া ভেঙ্গে দিতে তৎপর ছিলেন। করদরাজ্যগুলোয় ইসলামের পতাকা উড়াতে চাচ্ছিলেন। উড়িয়ে ছিলেনও।

সাঈদ ইবনুল আস (রা.)-এর বয়স কম হওয়ায় তিনি আমীরে মুআবিয়া (রা.)-এর চাকরিতে নিযুক্তি পেলেন। বিজয় সাধিত হবার পর তিনি তাঁর সাথে থাকা শুরু করেন।

হযরত উমর (রা.) সর্বদা কুরাইশীদের খবরা-খবর রাখছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে সাঈদ ইবনুল আস (রা.)-এর কথাও তিনি জানতে চান। তিনি জানতে পারেন সাঈদ (রা.) আমীরে মুআবিয়া (রা.)-এর অধীনে আছেন। তাঁর পরামর্শ সভায় থাকছেন।

পরে হযরত উমর (রা.) আমীরে মুআবিয়া (রা.)-এর কাছে ফরমান পাঠান, সাঈদ (রা.)কে মদীনা প্রেরণ করতে। তাঁকে মদীনা পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

মদীনায় সাঈদ (রা.) খলীফার পক্ষ থেকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা পান। খলীফা তাঁকে বলেন, সিরিয়া যুদ্ধে তোমার উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। আল্লাহ পাক তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

প্রস্তাব ও বিয়ে

একদিন খলীফা উমর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, বিয়ে করেছো কী?

তিনি বললেন, না।

: আবু আমর! এই ছেলের জন্য একটা মেয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পার না? দরবারী জনৈক লোককে লক্ষ্য করে উমর (রা.) বললেন।

দরবারী বললো, তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে কিন্তু তিনি অস্বীকার করেছেন।

হযরত উমর (রা.) মনে করলেন, একে যত দ্রুত সম্ভব বিয়ের পিঁড়িতে বসাতে হয়। বিয়ে না দিলে সে মদীনা থেকে সটকে পড়তে পারে। হযরত উমর (রা.) দ্রুতই নেমে পড়লেন পাত্রীর সন্ধানে। তিনি কূপের তীরে চারটি মেয়ে দেখতে পেলেন। বললেন, তোমরা কারা? বাড়ি কোথায়?

মেয়েরা বললো : আমরা সুফিয়ান ইবনে উয়াইফের মেয়ে। এদের সাথে এদের মাও ছিলেন।

মা বললেন : আমাদের পুরুষেরা যুদ্ধে মারা গেছে। পুরুষেরা শেষ হলে তাদের স্ত্রী ও মেয়েরা বিপাকে পড়ে। সমাজ-সভ্যতায় তারা অবহেলিত ও অপাংক্তেয় হয়ে যায়।

হযরত উমর (রা.) এই চার মেয়ের একজনের সাথে সাঈদ (রা.)-এর বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) একজন ও ওলিদ ইবনে ওকবাহ (রা.) যথাক্রমে অপর দু'জনকে বিয়ে করলেন।

আরব নারীদের প্রাচীনকাল থেকেই এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাদের কেউ বিবাহযোগ্যা হলে তারা পছন্দসই পুরুষের কাছে বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। এমনকি খোদ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে জনৈকা নারী বলেছিলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আমাকে বিয়ে করুন।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক্ষেত্রে হয় নিজে না হয় অন্য কোন সাহাবীকে বিয়ে করতে বলতেন। যেটি ছিল হালাল ও জায়েজ।

* * *

হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.)-এর কাছে নুয়াইম ইবনে মাসউদ আন নাহশালী (রা.)-এর মেয়েরা এলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য, সৎপাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে দেওয়া।

তাঁরা বললেন : যুদ্ধে পুরুষেরা শেষ হয়ে যায়। শিশুদের রেখে যায় এতিম করে। স্ত্রীদের রেখে যায় বিধবা করে। হযরত সাঈদ (রা.) তাঁদের একজনকে বিয়ে করেন। জুবাইর ইবনে মুতঈম (রা.)-এর কাছে একজনকে বিয়ে দেন। হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.) প্রাজ্ঞ সাহাবাদের একজন ছিলেন। দীনের দাওয়াতের প্রতিভূ ছিলেন। ইসলামের যে কোন সমস্যা এলে তিনি সবার আগেভাগে থাকতেন।

সাঈদ ও উসমান (রা.)

হযরত উসমান গনি (রা.) মুসলিম জাহানের খলীফা হলেন। তিনি তৃতীয় খলীফা। হযরত উমর (রা.)-এর পর তিনি মসনদে বসেন। সাঈদ ইবনুল আস (রা.)কে তিনি মজলিসে শুরার সদস্য করেন। তিনিও এ পদের যথাযোগ্য সম্মান আদায় করেন।

সাঈদ ইবনুল আস (রা.) বলেন, উসমান (রা.) খলীফা হবার পর আমি তাঁর নিকটতমদের একজন হয়ে পড়ি। তিনি আমার সাথে সদাচার করেন। আমার চাহিদা ও মনোবাঞ্ছার প্রতি নজর রাখেন। তাঁর আমানতদারিতে আমাকে শরীক করেন। আমাকে নানা পদে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্তি দেন।

এগুলো সবই হযরত উমর (রা.)-এর যুগে তাঁর কৃতকর্মের স্বীকৃতি ও অভিজ্ঞতার প্রাপ্তি।

হযরত উসমান তাঁকে নিকটে রাখতেন। ভালোবাসতেন। যে কোন বিষয়ে তাঁর সাথে আগে পরামর্শ করতেন। অনেক সিদ্ধান্তই তাঁর সুচিন্তিত মতানুযায়ী দিতেন। পরে খলীফা তাঁকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। বলেন, ইনসাফ কায়েম করতে। মানুষকে

কল্যাণমুখী করতে। জনতার সাথে কঠোরতা করতে না করেন। তিনি এসব গুরুত্বের সাথে শ্রদ্ধাভরে পালন করেন। শেষ পর্যন্ত খলীফা তাঁকে 'মা-অরাউন নাহ্র'-এর যুদ্ধে সেনাপতি বানান।

তিবরিস্তান জয়

খলীফা উসমান (রা.) সাঈদ ইবনুল আস (রা.)কে তিবরিস্তান যুদ্ধের সিপাহসালার বানান। যথা সময়ে মুসলিম বাহিনী মদীনা থেকে বেরোয়। সাহাবাদের বিশাল একটা অংশ এ যুদ্ধে অংশীদার হন। এমনকি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'নাতি হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.)ও এতে শরীক থাকেন। শরীক থাকেন ইবনে আব্বাস (রা.), আমর ইবনুল আস (রা.) ও যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.) প্রমুখ। সাঈদ (রা.)-এর আপ্রাণ চেষ্টা ছিল রাষ্ট্রটি মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত করা। তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করা।

* * *

সাঈদ (রা.) জুরজানও আক্রমণ করেন। যুদ্ধের দিনে অসম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর সম্পর্কে রটে যায়, তিনি পাহাড়ের সাথে যুদ্ধ করলেও তাকে পরাভূত করতে পারেন। বিজিত দেশে তিনি দ্বিতীয়বারের মত যেতেন। কোনও সৈন্য রয়ে সয়ে গেলো কি না তা দেখতেই তাঁর এই যাওয়া এবং সে দেশের অধিবাসীদের অনুগত করা। ব্যাপারটি আজারবাইজান যুদ্ধে কাজে লেগেছিল। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিদ্রোহ হলে সেখানে দ্বিতীয়বার গিয়ে তিনি তাদের দমনপূর্বক অনুগত করেন।

এরপর সাঈদ (রা.) কুফায় ফিরে যান। বিজয় শেষে ওখানে বসবাস শুরু করেন। যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.) এ সময়

তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি তাঁকে সাত লাখ দেরহাম দেন ও বলেন, বাইতুল মালে যদি এর চেয়ে বেশি থাকতো তাহলে তাও দিয়ে দিতাম।

পাঁচ বছরাধিককাল ধরে সাঈদ ইবনুল আস (রা.) কুফার গভর্নরী করেন। স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করার মনস্থ করেন। জনগণও এতে খুব খুশি। কিন্তু খলীফা উসমান (রা.)-এর ইচ্ছা তিনি মদীনা আসুন। খেলাফত কাজে তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করুন।

মদীনায়

সাঈদ (রা.) মদীনা এলেন। খলীফা উসমান (রা.)-এর সাথে মিলিত হলেন। ওই সময় মুসলিম সাম্রাজ্য একটু আধটু করে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করছিল। যাদের হৃদয়ে ঈমান জায়গা করে নিতে পারছিল না– সেসব দেশ করতলগত হলো। মুনাফিক গোষ্ঠী চারদিকেই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করল। চারদিকেই কানাঘুষা শুরু হলো। সাঈদ ইবনুল আস (রা.) এ সময় খলীফার পাশে থেকে শক্ত ভূমিকা পালন করেন। খলীফার কাছে গিয়ে একবার বলেন : আর কতদিন আমরা নিষ্ক্রীয় বসে থাকবো? ওরা (সাবাঈ) তো আমাদের খেয়ে ফেলল। ওদের কেউ কেউ রাতের আঁধারে আমাদের ঘরদোরে ঢিল ছুঁড়ছে, তীর মারছে। কেউ কেউ তলোয়ারে শানও দিচ্ছে। এক্ষণে আপনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চাই।

উসমান (রা.) বললেন : কসম আল্লাহর! আমি যুদ্ধ চাই না। চাইলে এতদিন ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। ওদের ব্যাপারটি আমি আল্লাহর হাতেই সোপর্দ করছি। আমার ব্যাপারে ওরা যা তা বলছে, আমি সে ব্যাপারটিও তাঁর দরবারে উত্থাপন করছি।

অচিরেই আমরা তাঁর দরবারে উঠতে যাচ্ছি। আর যুদ্ধের বিষয়টি আমি আদৌ ভাবছি না।

সাঈদ (রা.) বললেন : কসম আল্লাহর! এই বিষয়ে আর কোনদিনও আপনার কাছে আমি কিছু বলবো না। বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার পথে খলীফার প্রাসাদ ঘেরাওকারী বিদ্রোহীদের সাথে মোকাবেলা করেন। জনৈক সন্ত্রাসী এ সময় তাঁর মাথায় তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে। আঘাতের প্রকোপ তাঁর মগজে গিয়ে ঠেকে।

উসমান হত্যা

সাইয়েদুনা উসমান গনি (রা.) নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। সাঈদ ইবনুল আস (রা.) বিমর্ষ ও শোকাহত হয়ে বেরোন। মদীনা ছেড়ে তিনি বসরামুখো হন। তাঁর সাথে কিছু লোকজনও ছিল। 'মাররুয যাহ্‌রানে' এসে তিনি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন।

সমবেত সাথীরা! উসমান গনি (রা.) দুনিয়াতে শান্তিবাদী নেতা ছিলেন। দুনিয়া থেকে শান্তিবাদী ও অহিংস নীতিতে চলে গেছেন। শাহাদতের শিরিন শরাব পান করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর মর্যাদা বহুগুণে বাড়িয়ে দিবেন। গুনাহ মার্জনা করবেন। সম্মাননা বাড়িয়ে দিবেন।

مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا

> এঁরাই তাঁরা যাঁদেরকে আল্লাহ পাক নেয়ামত দিয়েছেন। তাঁদের হাশর হবে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারদের সাথে। বন্ধু হিসেবে এঁরাই উত্তম। [নিসা : ৬৯]

সাঈদ ইবনুল আস (রা.) সঙ্গী সাথীসহ মক্কায় অবস্থান করেন। মুআবিয়া (রা.)-এর খেলাফতের আগ পর্যন্ত মক্কায়ই থেকে যান।

সাঈদ (রা.) ও মুআবিয়া (রা.)

সাঈদ ইবনুল আস (রা.) সাধারণত প্রশাসকদের থেকে দূরে থাকতেন। যারা তাঁকে তলব করতেন তিনি তাদের সাথে থাকতেন না। অবশ্য যখন মুআবিয়া (রা.) মসনদে আসীন হলেন তখন তাঁকে খেলাফত কার্যক্রমে পরামর্শক থাকতে অনুরোধ জানালেন। কারণ, তাঁদের মাঝে আত্মীয়তার পাশাপাশি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও ছিল। সাঈদ (রা.)-এর প্রশাসনের প্রতি অনীহ দেখে মুআবিয়া (রা.) প্রথম সাক্ষাতেই তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। বলেন– আবু উসমান! তুমি আমাকে এড়িয়ে চললে; অথচ তোমাকে আমার কত যে দরকার! এ রাজত্বের দেখভাল ও পরামর্শদান করবে কারা?

না না! আমি আপনাকে এড়িয়ে চললাম কোথায়? আপনাকে আমি ভালো করেই জানি, রাষ্ট্র পরিচালনায় আপনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ। দুর্বলতা, সিদ্ধান্তহীনতা আপনার জীবনে নেই।

দেখো! তুমি আমাকে কিন্তু অবজ্ঞা করছো। মুআবিয়া (রা.) বললেন।

আমার অবজ্ঞায় আপনার কী এসে যায়? আমি আপনার কাছটিতেই আছি। ডাকলেই পারেন। নির্দেশ করলেই অনুগত দেখবেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ! তোমার থেকে আমি এই-ই চেয়েছিলাম। এতদিনের অভিযোগ আমি ভুলে গেলাম।

* * *

মুআবিয়া (রা.) সাঈদ ইবনুল আস (রা.)কে সিরিয়ায় নিয়ে এলেন। নিয়ে এলেন তাঁর সঙ্গী সাথীদেরও। বললেন : সিরিয়াবাসী হে! ওরা আমার জাতি। ওরা ইসলামী খেলাফতের অতন্দ্র প্রহরী।

পরে তিনি সাঈদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। বললেন : তোমার সহায়-সম্পদের অবস্থা কী? আমি যতদূর শুনেছি, এ নিয়ে তোমার কোনও মাথা ব্যথা নেই।

সাঈদ (রা.) বললেন : আমিরুল মুমিনীন! আমার সামান্য কিছু মাল যে নাই তা নয়। ওগুলো প্রয়োজনে ব্যয় করে ফেলি। অতিরিক্ত কোথাও থেকে কিছু এলে দান করে দিই। কানাকড়িও কাছে রাখি না। আমার কোন লোভ নেই। ভোজন লিপ্সা নেই। ঋণীও নই আমি।

মুআবিয়া (রা.) বললেন : কতদিন ধরে তোমার এই অবস্থা? কতদিনই বা থাকবে এমনটা?

সাঈদ (রা.) বললেন, বছরের অর্ধেকটা এমনই থাকে। থাকবে।

অবশিষ্ট সময়টাতে কেমনে চল?

আমার আত্মীয়-স্বজনেরা দেয়। আমাকে অর্থ সংগ্রহে নামতে হয়।

আমার অর্থনীতিতে তোমার মতো স্বচ্ছ আর কাউকে দেখিনি।

সাঈদ (রা.) বললেন : আমিরুল মুমিনীন! আমি এ অবস্থায়ই সন্তুষ্ট। এতেই তৃপ্ত। আপনি যদি ধন-ধান্যে আমার দু'হাত ভরেও দেন তথাপিও আমি এ অবস্থায়ই থাকবো।

* * *

আমীরে মুআবিয়া (রা.) তাঁকে ৫০ হাজার দিরহাম দেবার নির্দেশ দেন। বলেন : এর দ্বারা তোমার প্রয়োজন সারো। ঠেকায় কাজে দিবে।

আমার প্রয়োজন দারিদ্র্যের ক্ষুধা নিবারণ। কন্যাদায়গ্রস্তের বিবাহের সুব্যবস্থাকরণ। নিঃস্ব বন্দী মুক্তিকরণ। বন্ধুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও প্রতিবেশীর দুরবস্থা বিমোচন।

মুআবিয়া (রা.) বললেন : ঈমানের পরে দানের মতো ইবাদত আর নেই। তোমার জন্য যথেষ্ট যে, আল্লাহ পাক তোমার চরিত্রে দানের ব্যাপারটি রেখেছেন।

সাঈদ ইবনুল আস (রা.) আমীরে মুআবিয়া (রা.)-এর সাথে থেকে যান। খলীফা তাঁর যে কোন আবদার ফেলতেন না। তাঁকে বছর খানেক মদীনার গভর্নরী দান করেন। মারওয়ান ইবনুল হাকাম থাকেন এক বছর। তাঁর খেলাফতের কালো অধ্যায় যতটুকু যা তা পুত্র ইয়াজিদকে নির্বাচন নিয়ে। সাঈদ (রা.) মুআবিয়া (রা.)-এর শাসনকালেই মারা যান। তিনি আজীবন তাঁর গুণ-গান চর্চা করেন।

দানশীলতা

তাঁর জীবদ্দশায় দানশীলতায় কেউ তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। পরবর্তীতেও পেরেছে কিংবা পারবে কি না তাও বলা মুশকিল। যদি না সমগ্র ইতিহাসবেত্তা আর কাহিনীকার তাঁর কথাগুলো না

লেখতো তাহলে তাঁর জীবনের অনেক কিছু আমাদের অজানা থেকে যেতো। তাঁরা তাঁকে দানের ক্ষেত্রে কিংবদন্তীতুল্য করেছেন। এরই খানিক নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে একে একে।

চারটি রক্তঋণ

একবার জনৈক মরুবাসী মদীনায় এলো। সে চারটি খুনের মামলার আসামী। চারটি খুনের রক্তঋণও বদলা (দিয়ত) তার স্কন্ধে অর্পিত। অনেক টাকার প্রয়োজন তাঁর। মদীনায় এসেছে সেই রক্তঋণ উসূল করা যায় কি না এই আশায়। তাঁকে বলা হলো, তুমি চারটি দিয়ত বা রক্তঋণের টাকা যদি পেতে চাও তাহলে চারজনের কাছে যেতে হবে তোমাকে।

১. সাঈদ ইবনুল আস (রা.)।

২. হাসান ইবনে আলী (রা.)।

৩. আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.)।

৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)।

মরুচারী মসজিদে এলো। দেখলো বেশ ক'জন সঙ্গী-সাথীসহ একলোক বেরোচ্ছেন। তিনি জানতে চাইলেন, কে এই লোক?

বলা হলো, ইনি সাঈদ ইবনুল আস (রা.)।

সে বললো, চারজনের একজন তো ইনি।

সে তাঁর পিছু নিল। যে উদ্দেশে এসেছে তা তাঁকে জানালো। আরও জানালো চারজন থেকে চারটা দিয়ত 'রক্তঋণ' আদায় করবে। আপনি এঁদের একজন। প্রথমেই আপনার দেখা। তাই আপনাকে দিয়েই শুরু।

হযরত সাঈদ (রা.) নিরুত্তর। বাড়িতে পৌঁছেই তিনি অর্থ ব্যবস্থাপককে বললেন : এই যাযাবরকে বলো, লোকজন নিয়ে আসতে।

বলা হলো, তোমার লোকজন কোথায়?

যাযাবর বললো, আল্লাহ সাঈদ (রা.)কে মাফ করুন। আমি নগদ অর্থ চেয়েছি– খেজুর নয় যে কয়েক বস্তা দিয়ে দিবেন।

পুনরায় বলা হলো, কথা বাড়িও না। যা বলছি তাই কর।

শেষ পর্যন্ত তাকে ৪০ হাজার দিরহাম দেয়া হলো। যাযাবর ওগুলো বহন করে নিয়ে গেলো। বাকি তিনজনের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন পড়লো না। কেননা, চারটি রক্তঋণ এই অর্থেই আদায় করা সম্ভব।

আপনার কাছে পাওনা আছে

হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.)-এর কাছে জনৈক লোক এলো। বললো, আপনার কাছে কিছু পাওনা আছে।

সাঈদ (রা.) বললেন, কী পাবে?

অমুকের বাড়ির ওখানে একজনকে আপনি কিছু দিয়েছেন। পরের বাড়িতে গিয়ে যদি কাউকে কিছু দিতে পারেন, তাহলে আপনার বাড়িতে এলাম আমি– আমার পাওনা থাকবে না?

হযরত সাঈদ লোকটার কথায় হেসে দশ হাজার দেরহাম দান করলেন।

হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.) যখন কুফার গভর্নর তখন প্রতি সপ্তাহে ভাই-ব্রাদার ও পাড়া-প্রতিবেশীদের দাওয়াত করতেন।

তাঁদের সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করতেন। দামী দামী পোশাক-আশাক হাদিয়া দিতেন। মূল্যবান উপঢৌকন দিতেন। অনুপস্থিত পরিবারের জন্যও উপহার সামগ্রী পাঠাতেন।

প্রতি জুমাবারে তাঁর খাদেম মসজিদে আসতো। তাঁর হাতে থলে ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা থাকতো। তিনি সেগুলো মুসল্লিদের মাঝে বিলি করতেন। এজন্য কুফার মসজিদ লোকে লোকারন্য থাকতো।

* * *

মদীনার কোন এক বাড়ি থেকে এক গ্লাস পানি পান করলেন। কিছুক্ষণ পর বাড়িওয়ালা লোকজন তাঁর সাথে একান্ত বৈঠকে বসলো। বাড়িওয়ালা বাড়িটি বিক্রির প্রস্তাব রাখলো। বললো, চার হাজার দীনার ঋণের জন্যই তাঁর এই বিক্রি করা। সাঈদ (রা.) বললেন, তিনি আমার তৃষ্ণা নিবারণ করে আমাকেই ঋণী করে ফেলেছেন। বাহনে চাপার আগেই তাঁকে চার হাজার দীনার দিয়ে বাড়িটি তাকেই আবার দান করে দিলেন।

একবার জনৈক গ্রাম্য বুদ্দু সাঈদ ইবনুল আস (রা.)-এর কাছে কিছু চাইলো। তিনি তাঁর উপদেষ্টাকে বললেন, একে পাঁচশ' দিয়ে দাও।

উপদেষ্টা চলে গেল। খানিক বাদে ফিরে এসে বললো, দিরহাম দিব না দিনার?

সাঈদ ইবনুল আস (রা.) বললেন : আরে ভাই! আমি তো দিরহামের কথাই বলছি। তা তুমি যখন দিরহাম আর দিনারের সংশয়ে পড়ে গেছ তখন দিনারই দিয়ে দাও। লোকটা দিনার নিয়ে কৃতজ্ঞতায় কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

সাঈদ ইবনুল আস (রা.) বললেন : তুমি কাঁদছো যে! আল্লাহ কী তোমার অভাব পূরণ করবেন না এর দ্বারা?

লোকটা বললো : কেন নয়! আমি কাঁদছি ভূ-পৃষ্ঠে আপনার মতো লোক এখনও আছে বলে পৃথিবী টিকে আছে।

বাইতুল মালের সবই খরচ করলেন

আমীরে মুআবিয়ার যুগে সাঈদ ইবনুল আস (রা.) মদীনার গভর্নর ছিলেন। এ সময় মদীনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তিনি জনতার উদ্দেশে বাইতুল মাল উন্মুক্ত করে দিলেন। কেন্দ্র থেকে আরও তলব করলেন। আমীরে মুআবিয়া (রা.) তাঁর কাছে রাগত ভাষায় চিঠি লিখলেন : সাঈদ, আমদের সব মাল খরচ করেও সন্তুষ্ট হতে পারেননি! বাইতুল মাল উজাড় করে নতুন করে অতিরিক্ত বরাদ্দ চাচ্ছেন!

* * *

সাঈদ ইবনুল আস (রা.)-এর আরেকটি বদান্যতা এই যে, তিনি একবার সিরিয়া থাকতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মুআবিয়া (রা.) তাঁর সেবায় এলেন। শুরাহবিল ইবনে সিম্ত এবং মুসলিম ইবনে ওকবাও তাঁর সাথে ছিলেন।

সাঈদ ইবনুল আস (রা.) আমীরে মুআবিয়া (রা.)কে দেখে বুকে ব্যথার মোচড় অনুভব করলেন। শায়িত অবস্থা থেকে বসার চেষ্টা করলেন। মুআবিয়া (রা.) তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, আবু উসমান! ওঠার চেষ্টা করো না। তুমি রোগে শয্যাশায়ী।

সাঈদ (রা.) বিছানায় পড়ে গেলেন। আমীরে মুআবিয়া তাঁর হাত ধরে শুইয়ে দিলেন। নিজেও পাশে বসলেন। তাঁর রোগ ও ঘুম

সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন। খাদ্য-খাবারের কথা জানলেন। ওষুধ-পথ্যাদি নিরীক্ষণ করলেন। দীর্ঘক্ষণ তাঁর পাশে কাটালেন।

ওখান থেকে চলে আসার সময় শুরাহবিল ইবনে সিমতের দিকে তাকালেন। তাকালেন ইয়াজিদ ইবনে শাজারার দিকে। বললেন : তোমরা সাঈদের ঘরে কোন মাল-সম্পদ দেখেছো?

তাঁরা উভয়ে বললেন : উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু দেখলাম না।

খলীফা এবার মুসলিম ইবনে ওকবা (রা.)কে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার বক্তব্য কী মুসলিম?

মুসলিম : আমি দেখেছি।

: কী দেখেছো?

তাঁর পরিবার-পরিজন ও গোলামদের দেহে ময়লা পোশাক দেখেছি। উঠান ঝাড়মুক্ত। ব্যবসায়ীদের দেখেছি ঝগড়া করতে।

মুআবিয়া (রা.) বললেন : সত্য বলেছ। এগুলো দেখেছি আমিও।

মুআবিয়া (রা.) মুসলিম ইবনে ওকবাকে বললেন, তাঁকে তিন লাখ দিরহাম দেওয়া হোক।

আমীরে মুআবিয়া (রা.)-এর উপদেষ্টা এই সুসংবাদ সাঈদ ইবনুল আস (রা.)কে দিলেন।

* * *

সাঈদ ইবনুল আস (রা.) আমীরে মুআবিয়া (রা.)-এর সাহায্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে দূতের ওপর রাগ ঝাড়লেন। বললেন, তোমাদের খলীফা মনে করেছেন তিনি একটা ভালো কাজ করেছেন। আমি বলছি, তিনি মন্দ কাজ করেছেন। তিনি এখানকার দৈন্যদশা দেখে বিশ্লেষণে ভুল করেছেন। শোন, তাঁরা

যা দেখে প্রভাবিত হয়েছেন তন্মধ্যে আমার লোকজনের দেহে ময়লা পোশাক, সেটা তাদের নিজেদের কাজ নিজেরা করার দরুন হয়েছে। আর ঘরদোর ঝাড়মুক্ত বা ময়লা থাকার ব্যাপারটার রহস্য হলো, আমি তাদের দলভুক্ত হতে চাই না– যাদের ঘরদোর ও উঠান আয়নার মত পরিচ্ছন্ন রাখার পক্ষপাতি। নিকটাত্মীয় ও ঠেকাগ্রস্তরা কীভাবে মারা গেল এ নিয়েও আমার নেই কোন পরওয়া। রয়ে গেল ব্যবসায়ীদের বচসা। এটা তাদের পণ্যসামগ্রী বেচাকেনার প্রতিযোগিতার দরুন। কেননা, দান করার জন্য এদের থেকে আমি কিনতাম, অর্থাভাবে এখন খরিদ করছি না। এজন্যই ওদের বচসা।

সবশেষ কথা হলো, খলীফা আমার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করেছেন, আমি তা আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারীদের দেব। তোমাদের শাসকের থেকে মাত্র এক লাখ গ্রহণ করবো। শুরাহবিলকে দেব এক লাখ। ইয়াজিদ ইবনে শাজারাকে বাকী এক লাখ। সবই ব্যয় হবে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে। আল্লাহ পাক আমীরে মুআবিয়ার হাত আরও প্রশস্ত ও উন্মুক্ত করে দিন নিরন্ন মানবতার সেবায়।

বাকপটুতা ও অলংকারশাস্ত্র

হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.) ছিলেন বাগ্মী, অলংকারশাস্ত্রবিদ। তবে প্রয়োজন ছাড়া তিনি কোনও বাক্য ব্যয় করতেন না। শ্রোতার উপকার হবে ভেবেই তিনি বাক্যব্যয় করতেন। তাঁর কথা হতো প্রাঞ্জল ও ঝরঝরে। অস্বচ্ছ ও ধোঁয়াটে নয়।

হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.) তাঁর পুত্র আমরকে লক্ষ্য করে বলেন : বৎস! আল্লাহ সেই সম্পদে অকল্যাণ দেন যা চেয়েচিন্তে

সংগ্রহ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে তুমি যদি কোন মানুষের চেহারায় রক্ত দেখো আর ভাবো তাকে দেব কি দেব না, তাহলে যদি তোমার সব মালও তাকে দিয়ে দাও কাজ হবে না।

* * *

তিনি বলেন : প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া থেকে অদ্যাবধি আমি কোনও মানুষকে গালি দিইনি। আমার হাঁটুর সাথে কারও হাঁটু লাগেনি কোনদিনও।

* * *

সাঈদ (রা.) বলেন : আমার মজলিসে আগত ব্যক্তিকে তিন ধরনের সংবর্ধনা দিই। ১. প্রবেশকালে সংবর্ধনা দিই। ২. বসতে গেলে প্রশস্ত জায়গায় বসাই এবং ৩. কথা বলতে গেলে আগ্রহভরে শুনি।

* * *

তিনি বলেন বৎস! অভিজাত মানুষের সাথে ইয়ার্কি করো না। তাহলে তারা তোমার প্রতি হিংসুটে হবে। নিকটজনের সাথেও ঠাট্টা করো না। তাহলে তারা তোমাকে হালকা ভাববে।

* * *

মুআবিয়া (রা.) একবার তাঁকে বললেন : তোমার সন্তান কয়টি?

তিনি বললেন : দশটি। তন্মধ্যে পুত্র সন্তানই অধিক।

মুআবিয়া বললেন :

وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ

যাকে খুশি পুত্র সন্তান দেন। [শূরা শুরা ৪৯]

সাঈদ (রা.) বললেন :

تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ

তিনি যাকে খুশি রাজত্ব দেন। আর যার থেকে চান রাজত্ব ছিনিয়েও নেন। [আল ইমরান : ২৬]

* * *

তিনি তাঁর এক পুত্রকে ওসিয়ত করতে গিয়ে বলেন : বৎস! আমার মেয়েদের এমন কোন পাত্রের সাথে বিয়ে দেবে না যারা আল্লাহতুষ্ট নয়।

০ বৎস! আমার ভাইয়েরা যদি শেষও হয়ে যায় তাহলে আমার নেক কাজ যেন শেষ না হয়।

০ বৎস! তোমার চোখের তারায় আমি দানের দ্যুতি দেখছি। তুমি যখন দোলনায় দোল খাচ্ছিলে এ সে সময়ের কথা। এক্ষণে তাহলে কী তা বলাই বাহুল্য।

০ বৎস! চরিত্র মাধুর্যে কেউ শিথিল হলে দুশ্চরিত্র লম্পটরা তার মাথার উপর চড়ে বসে। তিক্ত ফলের স্বাদ সেই নেবে যে এর শুভ পরিণতি জানে।

* * *

তিনি বলেন : সেই ব্যক্তির জন্য আমি কী করতে পারি যে কালকের ভাবনায় আজ ঘুমাতে পারে না। সে সেই ভাবনায় কিছু প্রাপ্তির আশায় আমার মজলিসে আসে। আমার সাথে কথা বলে। এক পর্যায়ে আমার মন আকৃষ্ট করে।

সাঈদ ইবনুল আস (রা.) বলেন : দুই ব্যক্তির সামনে আমি কথা বলতে অপারগ। এক. যখন কোন বোকা আমার উদ্দেশে কিছু বলে। দুই. আমার কাছে কিছু চায়।

আসমাঈ বলেন, সাঈদ ইবনুল আস (রা.) একবার তাঁর ভাষণে বলেন : আল্লাহ যাকে উত্তম রুজি দান করেছেন সে সৌভাগ্যবান মানুষ। সে যে কোন এক ধরনের উত্তরাধিকারী রেখে যায়–

এক. হয় তার উত্তরাধিকারী নেককার– যার কোন উচ্চাশা থাকে না।

দুই. না হয় তার উত্তরাধিকারী বদকার– তার জন্য দুনিয়াতে কোনই প্রাপ্তি থাকে না।

অবস্থান ও মর্যাদা

হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.) ছিলেন অকল্পনীয় দানবীর। তিনি মুক্তপ্রাণে দান করতেন। এজন্য তিনি কোন প্রতিদানের অপেক্ষা করতেন না। কারও কৃতজ্ঞতারও আশা করতেন না। খেলাফত তো দূরের কথা, গভর্নরী পদের প্রতিও সামান্য লোভ ছিল না তাঁর।

এজন্য সকলে তাঁকে আলাদা নজরে দেখতো। সবার উপরে ঠাঁই দিত। আর তাঁর দান-দক্ষিণা তো ছিলই। তাঁর প্রকৃতিই ছিল দানের প্রকৃতি।

* * *

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৈশবেই তাঁর জাত চিনতে পেরেছিলেন। যখন জনৈকা মহিলা একজন অভিজাত দানবীরকে চাদর উপহার দিতে চেয়েছিলেন, প্রিয়নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র সাহাবাদের দিকে নজর বুলিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকেই চাদরটি দিতে বলেছিলেন। অর্থাৎ সাঈদ ইবনুল আস (রা.)কে। সুতরাং তিনি নববী দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন।

* * *

হযরত উমর (রা.) যখন তাঁকে দেখলেন যে, তাঁর প্রতি সাঈদ বিরাগভাজন তখন এর কারণ জানতে চাইলেন এবং তাঁর মনের খুনসুটি দূর করার উদ্যোগ নিলেন। উমর (রা.) কারও খুনসুটি দূর করার মত ব্যক্তি নন; কিন্তু হযরত সাঈদ (রা.)-এর বিশেষ মর্যাদার দিকে তাকিয়ে উদ্যোগটি তিনি নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোমার বাবার হত্যাযজ্ঞ আমার দ্বারা হয়নি।

সাঈদ (রা.) বলেছিলেন : যদি আপনি হত্যা করেও থাকেন তথাপিও আপনি সত্যের ওপর ছিলেন, আছেন। আমার বাবা ছিলেন বাতিলের ওপর। এ কথায় আমিরুল মুমিনীনের দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদা ও অবস্থান আরও বেড়ে যায়।

শুধু কী উমর (রা.)? হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা.)ও তাঁকে সমীহ করতেন। সম্মান করতেন। তাঁর উচ্চ মর্যাদা জানতেন। তারপরও তিনি একটু ভাবনায় পড়েছিলেন যে, তাঁর খেলাফত শেষে সাঈদ (রা.) খেলাফতের দাবী পূরণ করতে পারেন। এটি ইয়াজিদকে খলীফা ঘোষণার আগের কথা।

হযরত কাবিসা ইবনে জাবের (রা.) মুআবিয়া (রা.)কে প্রশ্ন করেছিলেন : আচ্ছা! আপনার পরে কে খলীফা হতে পারে?

আমীরে মুআবিয়া (রা.) বলেছিলেন : কুরাইশের মধ্যে হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.)ই।

হযরত সাঈদ ইবনে আবদুল আজিজ দামেস্কী বলেন : আরবি কুরআন সাঈদ ইবনুল আস (রা.)-এর ভাষায় নাযিল হয়েছে। কেননা, তাঁর সুর ও স্বর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত অবিকল।

এজন্য হযরত উসমান (রা.) তাঁকে কুরআন সংকলন বোর্ডের সদস্য করেছিলেন।

মৃত্যু

প্রাণী মাত্রেরই যে সত্যটি মেনে নিতে হয় তার নাম মৃত্যু। সাঈদ ইবনুল আস (রা.)কেও এই সত্যটি মেনে নেওয়ার প্রস্তুতি নিতে হলো। আর এর শুরুটা মারাত্মক রোগের মাধ্যমে। তিনি তখন মদীনার উপকণ্ঠে থাকতেন। এ সময় পুত্র আমর (রা.)কে বলেন : বৎস! দেখছো আমার প্রতি কি আপতিত হয়েছে?

পুত্র বললেন : আব্বাজান! আপনাকে মদীনায় নেব কী?

তিনি বললেন : আমার চলৎশক্তি রহিত। মদীনায় জীবিত অবস্থায় বুঝি যাওয়া হবে না। সে সময় আর নেই বাবা! খাটিয়ায় করেই নিয়ে যেও। আমি জানি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ওপারেই আমার দেখা হবে। এ পর্যন্তই ... আর বলা হলো না তাঁর। না বলা কথা ভেতরেই রয়ে গেল। কালেমা উচ্চারণের সাথে সাথে প্রাণপাখি উড়ে গেল মাওলার দরবারে। আত্মীয়-স্বজন তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে রেখে এলো। চিরনিদ্রায় বিভোর হলেন আরব জাতির দানের প্রতীক সাঈদ ইবনুল আস (রা.)।

মৃত্যু পরবর্তী দান

হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.) মৃত্যু পরবর্তী দানের জন্য তাঁর পুত্রকে ওসিয়ত করে বলেন : আমি যখন মারা যাবো আর তুমি আমার দাফন থেকে ফারেগ হবে তখন তোমার বাহন সরাসরি আমীরে মুআবিয়ার প্রাসাদে নেবে। তাঁকে বলবে, আমার বাবা তাঁর জমিটুকু দীনের কাজে ব্যয় করতে চায়। আপনি তাঁর থেকে সে জমিটুকু গ্রহণ করে ইসলামের কাজে ব্যয় করুন।

দাফন শেষে আমর ইবনে সাঈদ যখন সিরিয়া গেলেন, আমীর মুআবিয়া (রা.)-এর প্রাসাদে গিয়ে বাবার মৃত্যু সংবাদ দিলেন। আমীরে মুআবিয়া (রা.) শোক প্রকাশ করলেন। বললেন, তোমার বাবা যত ঋণ রেখে গেছেন তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার।

আমর ইবনে সাঈদ (রা.) বললেন : আমিরুল মুমিনীন! সেটা তিনি জানতেন। তবে তিনি তাঁর একখণ্ড জমি বিক্রির নির্দেশ করে গেছেন। সে জমিটুকু অমুক স্থানের।

মুআবিয়া (রা.) বলেন : আমীরে মুআবিয়া ওই জমি খরিদ করে বাইতুল মাল থেকে নগদ অর্থ পরিশোধ করলেন এবং সাঈদ (রা.)-এর ওসিয়ত মত দীনের কাজে লাগালেন।

* * *

জনৈক কুরাইশী হযরত সাঈদ (রা.) স্বাক্ষরিত একটি চেক নিয়ে এলেন। চেকটি ২০ হাজার দিরহামের। এতে সাক্ষ্য হিসেবে তাঁর খাদেমের সইও বিদ্যমান।

আমর ইবনে সাঈদ (রা.) বলেন : বাবার এই সই সত্য। তিনি তাঁর বাবার খাদেমকে ডাকলেন। বললেন, তুমি এই চেক সম্পর্কে কিছু জানো কী?

খাদেম এর সত্যতা স্বীকার করলো।

আমর বললেন : বাবার এই ঋণের (চেক দানের) অর্থ কী?

খাদেম বললো : এই লোক আপনার আব্বাজানের সাথে সাক্ষাত করেছিল। তাঁর প্রয়োজনে বেশ কিছু সফরও করেছিল। এক সময় সে ফিরে এলো। আপনার বাবা তাঁর চেহারা মলিন দেখে জানতে চাইলেন, তোমার মুখটা গোমরা কেন?

লোকটা বলেছিল : আমি হাজার বিশেক দিরহামের ঋণী। ঋণশোধ করতে পারছি না। এজন্য মনটা মরা। মুখটা গোমরা।

আপনার বাবার কাছে তখন এই অংকের মুদ্রা ছিল না। তিনি আমাকে একটা চেক আনতে বললেন। পরবর্তীতে পরিশোধ্য (মেয়াদী চেক) বলে চেকটি তার হাতে তুলে দিলেন।

আমর বললেন : এসো! তোমাকে নগদ ২০ হাজার দিরহাম দিচ্ছি।

আল্লাহ পাক সাঈদ (রা.)-এর প্রতি রহম করুন। তিনি জীবদ্দশায় যেভাবে দানবীর ছিলেন, সেভাবে দানবীর হলেন মরার পরেও।

رضى الله ورضوا عنه

স মা প্ত

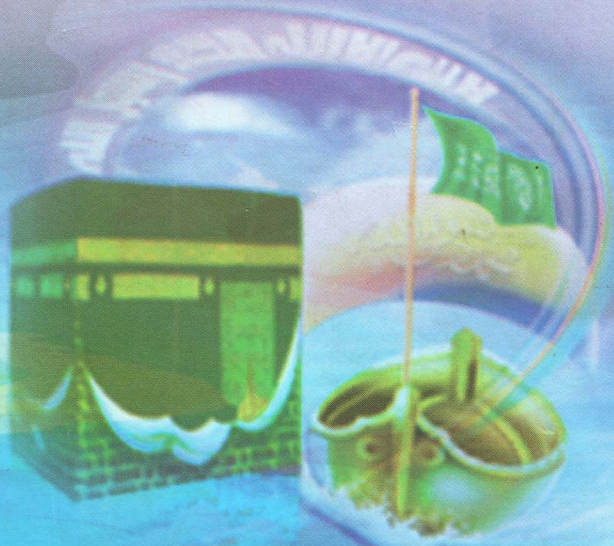

আল-মাকতাবাতুল হানাফিয়্যাহ
মীমবা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার

ISBN-984-70097-0019-4